কী মায়া

সুবোধকুমার চক্রবর্তী

করুণা প্রকাশনী
১১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট · কলকাতা বারো

প্রথম প্রকাশ
আশ্বিন ১৩৬৭

প্রকাশক :
শ্রীবামাচরণ মুখোপাধ্যায়
১১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মু
শ্রীরতিকান্ত ঘোষ
দি অশোক প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৭।১, বিন্দু পালিত লেন
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট :
শ্রীগণেশ বসু

॥ দাম : তিন টাকা ॥

শ্রীমতি কমলা দেবী

শ্রীসুধীরকুমার চক্রবর্তী

শ্রীচরণকমলেষু

লেখকের অন্যান্য বই :

রূপম ? একটি আশ্বাস ; মণিপদ্ম ; সেই উজ্জল মুহূর্ত ; অয়ি অবগুন্ঠনে ; জনম জনম ; তুঙ্গভদ্রা ।

রম্যানিবীক্ষ্য :

দক্ষিণ ভারত পর্ব, দ্রাবিড় পর্ব, কালিন্দী পর্ব, সৌরাষ্ট্র পর্ব, রাজস্থান পর্ব ।

কী মায়া

এক

নদীর জলে আবর্তের চিহ্ন কখনও লেগে থাকে না। কিন্তু কী মায়া আছে বেদের জীবনে জানিনে, এক একটা দেশের কথা মানুষের কথা স্বপ্নের মতো জেগে থাকে। দুর্বল মুহূর্তে দোলা দেয় সবল মনটাকেও।

কাজে আর অকাজে কত দেশ তো ঘুরে দেখলুম, কত অদ্ভুত জায়গা, কত অদ্ভুত মানুষ, কত অদ্ভুত ঘটনা। নোট বুকে সে সব টুকে রাখলে কত অদ্ভুত গল্প হত।

ভেবেছিলুম, সবই হয়তো বেমালুম ভুলে গেছি। কিন্তু আজ লিখতে বসে দেখছি, ভুলেছি অনেক। কিন্তু মনেও যা আছে, তারও শেষ নেই। সন তারিখ হয়তো মনে নেই, রাস্তা পথ ঘাট হয়তো গুলিয়ে গেছে খানিক, এক নামের পরিবর্তে হয়তো আর একটা নাম মনে আসছে। মনে তবু আসছে, আর এমন ভিড় করে আসছে যে আর পাঁচ জনকে না শুনিয়ে শান্তি পাচ্ছি না।

বেদের সঙ্গেও একটা সংসার আছে। স্ত্রী পুত্র পরিবার নিয়ে তারা ঘুরে বেড়ায়। যা কিছু তাদের বলার কথা, তা বলে বলেই তাদের ফুরিয়ে যায়। আমার বলার কথা সব বুকের ভিতরেই জমে আছে।

তেইশ বছর বয়সে পথে নেমেছিলুম, জীবনটা বেদের মতো কাটছে। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায়, এক কাজ থেকে আর এক কাজে। আত্মীয় পরিজনহীন নিঃসঙ্গ জীবন। সঙ্গের একটা চাকর কিংবা বিদেশী কতগুলো মানুষ কি একটা শিক্ষিত ক্ষুধার্ত লোককে যথার্থ সঙ্গ দিতে পারে? মনের কথা তাই মনের মধ্যেই রয়ে গেল, কাউকে বলা হলনা। আজ ভারি ঠেকছে বুকের ভিতরটা। যে কথা জমে আছে কান্নার মতো, আজ তা ঠেলে বেরতে চাইছে।

আমার জীবনযুদ্ধ শুরু হয়েছিল গত মহাযুদ্ধের আগে। ভারতবর্ষ থেকে মিশর গেলুম। মিশর থেকে মল্টা। তিব্বতেও গিয়েছিলুম ভাগ্যের অন্বেষণে। তারপর শান্তির লোভে শবরমতী। মহাত্মাজী তখনও বেঁচে ছিলেন। বলতে লজ্জা করে, এখন তাঁর নাম ভাঙ্গিয়ে খাচ্ছি।

প্রথমে মিশরের গল্প বলি। যুদ্ধের খাতায় নাম লিখে মিশর যাত্রা করেছিলুম। কিন্তু সে দেশের মাটিতে নামা হলনা। জাহাজেই খবর পেলুম যে আমরা প্রথম সারিতে যুদ্ধের যোগ্যতা অর্জন করেছি। প্রথম সারিতে দাঁড়িয়েই যুদ্ধ করব। চল মল্টা।

যুদ্ধের কাহিনী আজ থাক।

মল্টা থেকে ফেরার পথে কয়েকদিনের ছুটি নিলুম। পৃথিবীর প্রথম সভ্যতা যে দেশে দানা বেঁধেছে, সেই দেশ দেখবার সখ ছিল অপরিমিত। শুধু মিশরের স্ফিঙ্ক্স্ আর পিরামিড নয়, মিশরের মানুষও দেখব।

দেখলুম সাদিয়াকে।

কিন্তু সাদিয়া কি জাদু জানে! না না, কিছুতেই এ কথা আমি মানতে পারব না। লেখাপড়া শিখে বিশ্বাস করব কুসংস্কারে!

ধমক দিয়ে আনওয়ার বলল: বিশ্বাস তুই করবি, কিন্তু দেরিতে, যখন আফসোস করতে হবে। মন্ত্র পড়ে ভেড়া বানিয়ে ফেলেছে কিনা, তাই আজ সত্যি কথা বিশ্বাস করতে তোর বুক ফেটে যাচ্ছে।

প্রবলভাবে আমি আপত্তি জানালুম: তুই পাগল হলি আনওয়ার?

পাগল আমি, না তুই: আনওয়ার উত্তর দিল: মিশরের মাটিতে দাঁড়িয়ে ডাইনীকে যে কুসংস্কার ভাবে, আমি তাকে সুস্থ ভাবি নে। আমার মাথা তো খারাপ হয় নি।

হেসে বললুম: ওইটেই পাগলের লক্ষণ। পাগল নিজেকে ছাড়া আর সবাইকে পাগল ভাবে।

আনওয়ার এবারে সত্যিই রাগল, বলল : তোর সঙ্গে পাগলে তর্ক করে। আমি চললুম আমার কাজে।

যাবার সময় পিছনে ফিরে বলে গেল : দোহাই তোর, আজ আর যাস নে ওদিকে।

অনুরোধে আর্দ্র হল তার কণ্ঠস্বর।

বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা একসঙ্গে পড়েছি। কিছুদিন আগে আনওয়ার কায়রোতে এসে কারবার শুরু করেছে। করাচীতে তুলো চালানের কারবার। আর আমি দিন কয়েকের জন্য তারই কাছে বেড়াতে এসে এই বিপদ বরণ করে বসেছি। বিপদ সাদিয়ার জন্য নয়। বিপদ আনওয়ারকে নিয়ে। লোকটা নিজে ভীতু, নিজের ভয়কে অন্যের উপর চালান করতে চায়। তা না হলে সাদিয়ার মতো সরল মেয়েকে বলে ডাইনী!

মিশরের মোসলেম মেয়ে সাদিয়া, শরতের শতদলের মতো গোলাপী পাপড়ি মেলে এক ক্লান্ত দ্বিপ্রহরে আমায় মুগ্ধ করেছিল। শুধু তার রূপে নয়, তার হাসি ও গানে, তার উচ্ছল প্রাণের অন্তরঙ্গ আবেগে।

সেদিনের তারিখ বার তো লিখে রাখি নি! কায়রো থেকে ট্রামে চড়ে মীনা গিয়েছিলুম পিরামিড দেখতে, নীল নদের দীর্ঘ পুল পেরিয়ে গিজায় গাড়ি বদল করে। সেই দীর্ঘপথ একান্তভাবে একা অতিক্রম করে যখন মীনায় এসে পৌঁছলুম, তখন ক্লান্তি নেমেছে সারা অঙ্গে। চল্লিশ-পঞ্চাশ তলার সমান উঁচু দুটো পিরামিড পাশপাশি ছায়া বিস্তার করে দাঁড়িয়ে আছে। তারই একটির ছায়ার নিচে খানিকটা বিশ্রামের জন্য বসে পড়লুম।

গিজার বিখ্যাত পিরামিড দেখেছি অনেকবার। কায়রোর উপকণ্ঠেই দিগন্তবিস্তৃত মরুভূমি। তারই ধারে পিরামিডের সারি। তীর্থের মতো যাত্রীর আনাগোনা সেখানে লেগেই আছে।

খেওপ্‌সের পিরামিডই বোধ হয় সবচেয়ে বড়। সাড়ে চার শো

ফুট উঁচু আর এক একটা ধার প্রায় সাড়ে সাতশো ফুট লম্বা। আজ পাঁচ হাজার বছর ধরে তেরো একর জমি জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। ষাট-পঁয়ষট্টি মণ ওজনের তেইশ লক্ষ পাথর গেঁথে এই পিরামিড তৈরি হয়েছে। লোকের বিশ্বাস যে, এক লক্ষ মজুর কুড়ি বছর ক্রমাগত এই কাজ করেছে। আজ সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে এই ভেবে যে, কী করে এই বড় বড় পাথরগুলো একটার উপর আর একটা তুলেছে! স্থানীয় লোকের কাছে শুনেছি যে, বালি ফেলে ফেলে চারপাশে জমি উঁচু করত সে যুগের মানুষ, আর পাথর তুলত গড়িয়ে গড়িয়ে। তারপর সমস্ত পিরামিডটা তৈরি হয়ে গেলে কেটে কেটে বালির পাহাড় সরিয়ে দিত।

এইসব কথা ভাবছিলুম পিরামিডের ছায়ায় বসে বসে। আর দেখছিলুম, একটা পিরামিডের গা বেয়ে বেয়ে অনেক মেয়ে-পুরুষ উপরে উঠছে। আমাদের দেশের কুতবমিনারের ভিতর যেমন সুন্দর বাঁধানো সিঁড়ি আছে, এখানে তা নেই। বাহির দিয়ে মই বেয়ে ওঠার মতো একই সঙ্গে হাত ও পায়ের কসরত দরকার। একটু অন্যমনস্ক হলেই শেষ। পাহাড়ের গা বেয়ে গড়িয়ে পড়বার মতো অসহায়ভাবে গড়িয়ে পড়তে হবে। এক খণ্ড বড় পাথর কিংবা কোন ঝোপে ঝাড়ে যে আটকে বেঁচে যাব, তার সম্ভাবনাও দুরাশা। নিচে থেকে ওই পিঁপড়ের সারি দেখে মাথা ঝিম ঝিম করে।

আমার মতো বিদেশীও এসেছে অনেক। আমারই মতো ছায়ায় বসে তারাও বিশ্রাম উপভোগ করছে। কারও সঙ্গে কফির ফ্লাস্ক আছে, তারা কফির সঙ্গে স্যাণ্ডুইচ খাচ্ছে। আমার সঙ্গে খাবার ছিল না, কিন্তু আশ্বাস ছিল। মীনায় একটা হোটেল আছে—এ কথা জেনে এসেছিলুম আনওয়ারের কাছ থেকে। পিরমিড দেখার শখ মিটে গেলে হোটেলে গিয়ে দুপুরের আহার সেরে নেব, মনে মনে এই সংকল্প নিয়ে বেরিয়েছি।

সাদিয়ার সঙ্গে আমার পরিচয় হল এইখানে। ষোল-সতের

বছরের একটি চঞ্চল মেয়ে গানে কলস্বরে সমস্ত পরিবেশটা আবিষ্ট করে পিরামিড থেকে নেমে এল জলতরঙ্গের মতো। নামল একেবারে আমার কাঁধ ঘেঁষে। তাড়াতাড়ি সরে না গেলে হয়তো হুমড়ি খেয়ে আমারই ঘাড়ে পড়ত। ভেবেছিলুম, লজ্জা পেয়ে ক্ষমা চাইবে। কিন্তু চাইল না। উল্লাসে হাসিতে মিলিয়ে যা বলল, তা যে লজ্জিত হয়ে দুঃখ প্রকাশ নয় তা সহজেই বুঝতে পেরেছিলুম। আশেপাশে কয়েকজন বিদেশী বসে ছিলেন ছড়িয়ে ছিটিয়ে। তাঁদের সঙ্গে একজন দোভাষী ছিল। তারই সাহায্য প্রার্থনা করলুম।

নির্বিকারভাবে সে ছোকরা আমায় তার হাসির অর্থ জানিয়ে দিল, বলল: তোমার অক্ষমতা দেখেই হাসছে। এত দূরদেশ থেকে এত পরিশ্রম করে এসেছ পিরামিড দেখতে, নিচে থেকে দেখেই বুঝি ফিরে যাবে? বাড়ি বসে ছবি দেখলে তো এ কষ্টটুকুও স্বীকার করতে হত না।

হাসতে হাসতে মেয়েটি আরও কী সব বলল, দোভাষী সে কথারও অর্থ জানিয়ে দিল: উপরে উঠবে সাদিয়ার সঙ্গে? হাত ধরে তোমায় উপরে নিয়ে যাবে?

কী সাংঘাতিক মেয়ে! এইমাত্র উপর থেকে নেমেও এর শখ মেটে নি! এদের ওঠানামা দেখেই যে আমার বুকের ভিতরটা শুকিয়ে উঠছে! শঙ্কিতভাবে জবাব দিলুম: না না, শরীর আজ আমার মোটেই ভাল নেই।

দোভাষীর মুখে আমার জবাব শুনে সাদিয়া আরও খানিকক্ষণ হাসল।

হঠাৎ আমার দিকে কেন নজর পড়েছে, চারিদিকে চেয়ে সেইটেই বোঝবার চেষ্টা করলুম। দেখলুম, আমার মতো নিঃসঙ্গ কেউ নয়। আমিই শুধু নির্বাক দর্শকের মতো অন্যের আনন্দ কলরব একান্তে উপভোগ করতে এসেছি। আমার নিঃসঙ্গতা তাই কারও দৃষ্টি এড়িয়ে যাচ্ছে না।

অদ্ভুত এই সাদিয়া মেয়েটি। বলল : ওঠ না, হাত ধরে তোমায় টেনে তুলব।

দোভাষী বুঝিয়ে দিল যে সাদিয়া আমায় কিছুতেই ছাড়বে না। মীনার মেয়ে সে। নিত্য নতুন বিদেশী দেখছে, বিদেশীদের সঙ্গে ভাব করতেই তার ভাল লাগে। ছেলেবেলা থেকে এই খেলা খেলে আজও তার লজ্জা এল না। হেসে বলল : এ জায়গায় লাজ-লজ্জা গেছে যুদ্ধের সময়। ইতালির সঙ্গে লড়বার জন্যে ইংরেজের ক্যাম্প পড়েছিল এখানে। সেই থেকে আমরা বেহায়া হয়েছি।

তারপর ভয় দেখিয়ে বলল : সাদিয়া যখন জেদ ধরেছে, তখন ওপরে না তুলে ছাড়বে না।

সত্যিই সাদিয়া আমায় টেনে তুলল। করুণ চোখে একবার সবার দিকে চাইলুম। সবাই উপভোগ করছে আমার অবস্থাটা। সাহায্য করতে কেউ এল না।

খানিকটা উঠেও ছিলুম। কী বিরাট তার গা-টা! এত বড় পাথর বুঝি কোথাও দেখিনি। নিচের দিকে তাকিয়ে দেহের রক্ত যেন হিম হয়ে গেল। সাদিয়ার হাত ছাড়িয়ে হুড়মুড় করে নেমে পড়লুম।

সাদিয়া নেমে এল তরতর করে, তারপরেই হাসিতে লুটিয়ে পড়ল : ছি ছি, কী ভীতু হয় ভারতবর্ষের মানুষগুলো!

তার কথা শুনলেই আমি দোভাষীর মুখের দিকে তাকাই। সেই আমায় সব কথার মানে বুঝিয়ে দেয়।

এক সময় হাসি থামিয়ে বলল : অমন শুকনো মুখে বসে আছ কেন? ক্ষিধে পেয়েছে বুঝি? আছে দু একটা ফিলুস, কি পিয়াস্তার?

সত্যিই ক্ষিধে পেয়েছিল, কিন্তু ধারে কাছে খাবার জিনিস দেখছিলুম না। সাদিয়ার কথায় পকেট হাতড়ে পয়সা বার করে দিলুম। একটি ফিলুস আর একটি পিয়াস্তার সে তুলে নিল,

আমাদের দেশের তু আনা আর এক আনার মতন। তার পরেই বাজারের রাস্তায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমি আমার নিজের দেশের সঙ্গে এ দেশের স্থাপত্যকলা মিলিয়ে নিলুম। যে কথাটি সকলের আগে মনে এল, সেইটেই বোধ হয় সবচেয়ে বড় প্রভেদ। দক্ষিণ ভারতের গোপুরের মতো পিরামিডের বিশালতা আছে, নেই তার সূক্ষ্ম শিল্পনৈপুণ্য। শ্রম আছে, সৌন্দর্য নেই। এর কারণও খুব স্পষ্ট। বন্দী ক্রীতদাসেরা এই সব পিরামিড নির্মাণ করত বলে শোনা যায়। রৌদ্রদগ্ধ আকাশের নিচে রাজদণ্ডের ভয়ে তারা পরিশ্রম করে গেছে স্বেদসিক্ত দেহে। বাদশাহের খেলাত তারা পায় নি। ধর্মের প্রেরণা ছিল না তাদের অন্তরে, তাদের বুদ্ধিতেও ছিল না সৌন্দর্যের চেতনা।

বিদেশীদের একটি ছোট দল দোভাষীর সঙ্গে পিরামিডের ভিতরে ঢুকছিলেন। আমিও তাঁদের সঙ্গ নিলুম। যে প্রকোষ্ঠে শবাধারে আছে মৃতের মমি, আছে নানা অলঙ্কার তৈজসপত্র মূর্তি আর চিত্র, সে পথ চিরদিনের মতো বন্ধ করা আছে। অন্ধকারে টর্চ জ্বালিয়ে যে পথে আমরা এগোলুম, সে একটা নকল পথ।

হঠাৎ কে যেন আমার হাত টেনে ধরল। একটা তুরন্ত ভয় বিত্যুতের মতো চমকে উঠল পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত। নিমেষে সমস্ত শরীর অবশ হয়ে গেল।

হয়তো সেইখানেই বসে পড়তুম, কিন্তু তার দরকার হল না। সাদিয়ার তীক্ষ্ণ হাসিতে অন্ধকার গলিপথ আনন্দে উচ্চকিত হয়ে উঠল। ইচ্ছে হল, তাকে কড়া একটা ধমক দিই।

আমি সকলের পিছনে ছিলুম। সকলের অলক্ষিতেই আবার বেরিয়ে এলুম।

কোঁচড়-ভর্তি বেদানা আর একটা খরমুজ কিনে এনেছে সাদিয়া। আবার সেই ছায়াটুকুতে বসে তুজনে সেগুলোর সদ্ব্যবহার শুরু করলুম। ছোট বাতাবী লেবুর মতো গোটা বেদানাগুলো হাতের

মুঠোয় ভেঙে ভেঙে সাদিয়া এগিয়ে দিচ্ছিল। খেতে খেতে আমি দেখছিলুম তার মুখখানা। মনে হল, তার গাল দুটোও যেন ওই বেদানার দানার মতো রঙিন। আমার মুখের দিকে চেয়েই মেয়েটা হেসে উঠল। এত হাসতেও পারে মেয়েটা!

সারাদিন কী করে কাটিয়ে দিলুম, তা মনে রাখবার চেষ্টা করি নি। শেষ ট্রামে চড়ে কায়রোতে যখন ফিরলুম, অন্ধকার তখন নিবিড় হয়েছে। নীলনদের পুল পেরবার সময় প্রচণ্ড শীতে হাড়ের ভিতরেও কাঁপুনি ধরছিল। তবু ভাল লাগছিল এই রাতটা।

ব্যস্তভাবে আনওয়ার আমার অপেক্ষা করছিল। দেরির জন্য জবাবদিহি করতে হল। কিছুতেই ছাড়ল না। অকপটে সব কিছু স্বীকার করে রাতের মতো নিস্কৃতি পেলুম।

সকালবেলায় চা খাওয়া সেরে আনওয়ার বেরোয় কাজে। আর আমি বেড়াতে বেরই। মুচকি হেসে আনওয়ার বলল : আর যাস নে ওদিকে।

আমি হেসে বললুম : কেন, ভয় কিসের?

হাল্কাভাবে আনওয়ার বলল : ভয় নেই? এই ডাইনীর দেশে কে কোথায় তুকতাক করে দেবে, শেষে ভেড়া বনে যাবি।

হাসলুম একটুখানি, তারপর সিঁড়ির উপরেই একটা সিগারেট ধরিয়ে রাস্তায় নেমে পড়লুম।

পথ চলতে চলতে ভাবনা এল, আজ যাই কোথায়! থিবিস ও কার্নাক দেখে এসেছি। কায়রো থেকে সে প্রায় চার শো মাইল দূরে। কয়েকটা দিন ধরে দেখেছি সেই সব পুরানো জায়গা। নীলনদের দু তীরে সেই প্রাচীন নগরী। বিস্তৃত বালুতট ও গিরিকন্দরে মিশরের কত ঐশ্বর্য লুকনো আছে, তার সঠিক হদিস আজও মেলে নি। চুয়াল্লিশ বছর আগে ভ্যালি অব কিংসে বার্টার সাহেব আবিষ্কার করেছেন সম্রাট তুতাঙ্খমনের সমাধি। সে প্রায় তেত্রিশ শো বছর আগের ঐশ্বর্য।

খনস্ বা চন্দ্রদেবের মন্দিরে স্ফিঙ্ক্সের সারি দেখেছি, দেখেছি প্রথম রামেসেসের তৈরি আমন বা সূর্যের মন্দির। ছ হাজার বর্গ গজ জুড়ে সেই মন্দির, তার কী বিরাট বালিপাথরের থাম, সত্তর ফুট উঁচু আর বারো ফুট ব্যাস। নিচে পাথরের চাতালে বসে কত ছোট মনে হয়েছিল নিজেকে।

আমাদের মন্দিরের স্থাপত্যকলার সঙ্গে এইখানেই তার মিল দেখলুম। আমাদের গোপুরের মতো এদের পাইলন, দু ধারে দুই আস্ত পাথরের স্তম্ভ। এমন স্থান নেই যেখানে কোন চিত্র বা হায়ারোগ্লিফিক লিপিতে কিছু লেখা নেই।

দ্বিতীয় রামেসেসের ভাঙা মন্দিরও দেখেছি থিবিসে। রামেসেসের সেই বিরাট মূর্তির ভাঙা টুকুরোগুলো। যখন সোজা দাঁড়িয়ে ছিল, তখন নাকি সাতান্ন ফুট উঁচু ছিল এটা, আর ওজন এক হাজার টন। বিরাট পাথরগুলোর দিকে চেয়ে মনে পড়েছিল শেলির সনেটের লাইন: The hand that mocked them, and the heart that fed.

দেখেছি সোনালী পাহাড়ের কোলে রাণী হাতশেপসুটের সূর্যমন্দির। ক্ষমতার লোভে যে নারী তার ভাই রাজা তৃতীয় থোথমেসকে বিয়ে করে ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। কিন্তু এঁদের প্রীতির সম্বন্ধ কখনও গড়ে ওঠে নি। শেষে রাণীকে বিতাড়িত করে তাঁর সমস্ত স্মৃতিচিহ্ন মুছে ফেলতেও রাজা কুণ্ঠিত হন নি।

তৃতীয় আমেনফিসের তৈরি লুক্সরের মন্দিরও দেখেছি। কী বিচিত্র তার থামগুলি! একাধারে মোটা মসৃণ গোলগাল থাম দু সারি প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে আছে। আর এক ধারে গোছা গোছা তাল-গাছের মতো এক সারি স্তম্ভ। পঞ্চাশ ফুটেরও বেশি উঁচু হবে এগুলো।

আরও দেখেছি নীলের পশ্চিম তটে সেই বিখ্যাত কলোসি অব মেম্‌নন। ট্রোজান যুদ্ধের মেম্‌নন তৃতীয় আমেনফিসের এক জোড়া

প্রস্তরমূর্তি। চোষট্টি ফুট উঁচু। লোকে বলে, সূর্যোদয়ের সময় বাঁ দিকের মূর্তি থেকে সঙ্গীতের ধ্বনি ওঠে আজও।

আরও দেখেছি কত কি খুঁটিনাটি। মরা ও জীবন্ত জিনিস। দেশী ও বিদেশী মানুষ, পুরুষ ও নারী। কিন্তু সাদিয়ার মতো মেয়ে দেখেছি কি একটিও!

খিলখিল করে হেসে উঠল সাদিয়া, বলল: এসেছ তো আবার! আমি জানতুম, আজ আবার আসবে।

সেই দোভাষী ছোকরাটি দাঁড়িয়ে ছিল পাশে। সেই আমায় মানে বলে দিল। আমি আশ্চর্য হলুম নিজের দিকে চেয়ে। কখন গিজার ট্রামে উঠেছি, কখন গাড়ি বদলে মীনার মাটিতে এসে নেমেছি, কিছুই যেন মনে করতে পারছি না। নিজের কাছেই রহস্য ঠেকছে ঘটনাটা। পকেটে একবার হাত দিয়ে দেখে নিলুম, যেখানকার যা সব সেখানেই আছে। তার পরেই হেসে ফেললুম নির্মল আনন্দে।

পথ চলতে চলতে সাদিয়া বলল: হাসলে যে?

সেই দোভাষী ছোকরাটির আজ খদ্দের নেই। সেও চলেছে আমাদের সঙ্গে। তাকেই আমি প্রশ্ন করলুম: কী করে জানল সাদিয়া যে আমি আসবই?

প্রশ্নটা বুঝে নিয়ে সাদিয়া বলল: আমি যে মন্তর শিখেছি।

বলেই হাসিতে উচ্ছল হল।

আমিও মন্তর জানি: আমি জবাব দিলুম: এমন মন্তর জানি যে একেবারে ভারতবর্ষের পারে গিয়ে ঠেকবে।

এবারে দোভাষীও হাসল আমার কথা শুনে।

তারপর গম্ভীর হয়ে বললুম: কিন্তু কোথায় যাওয়া যায় বল তো? ওই পুরনো পিরামিডের নিচে আজ আর ভাল লাগবে না।

সাদিয়া বলল: ঠিক বলেছ। কিন্তু কোথায় যাওয়া যায়?

দোভাষী ফন্দি দিল, বলল: কেন, সাক্কারার সেরাপিয়াম দেখে এস। সেই সঙ্গে টির মস্তাবাটাও দেখে নিয়ো।

ঠিক বলেছ।

সাদিয়া খুশী হয়ে উঠল, কিন্তু আমি হলুম না। এই ছোকরা সঙ্গে আছে বলেই সাদিয়ার সঙ্গে কথা কইতে পাচ্ছি। তাকে ফেলে গেলে চলবে কেন!

কেন, পছন্দ হল না?

বললুম: এ না থাকলে আমরা কথা কইব কী করে?

সাদিয়া হেসে উঠল, বলল: তুমি দেখতে যাচ্ছ, না কথা কইতে?

আমি কিছু বলবার আগেই সেই ছোকরাকে কিছু হুকুম করল। তারপর বলল: ঠিক আছে, এও আমাদের সঙ্গে যাবে।

দোভাষী বলল: না গিয়ে আর উপায় কি। সাদিয়া যখন বলেছে, তখন আমায় না পেলে আমার মুণ্ডুটা নিয়ে যাবে। সাক্কারায় হোটেল আছে, কিছু খাইয়ে দিও। তা হলেই আমার চলে যাবে।

বললুম: সেই ভাল, তিনজনেই একসঙ্গে যাব।

প্রথমে আমরা সাক্কারার স্ফিঙ্ক্‌স দেখলুম। ঘনসন্নিবিষ্ট তাল ও খেজুর বনের ভিতর আড়াইটা মানুষের সমান উঁচু স্ফিঙ্ক্‌স। এর খুব কাছেই মিশরের প্রাচীন রাজধানী মেম্‌ফিস।

মিশরের বিখ্যাত স্ফিঙ্ক্‌স হল গিজার দ্বিতীয় পিরামিডের সামনে। দু শো চল্লিশ ফুট লম্বা আর ছেষট্টি ফুট উঁচু। বয়স প্রায় সাড়ে ছ হাজার বছর। একটা সিংহ বসে আছে থাবা পেতে, তার মানুষের মুখ। কেউ বলে, এ মুখ রাজা কেফরেনের। কেউ বলে, দেবতা হার্মাকিসের মুখ এটি। আবার অনেকের মতে স্ত্রীলোকের মুখ বললেও ক্ষতি নেই। সামনে যা দেখতে পাচ্ছি, তা দেখেই আমাদের আনন্দ। এই স্ফিঙ্ক্‌স আর এই সব পিরামিড বিশ্বের প্রাচীনতম সভ্যতার প্রতীক। সেই পরিচয়ই তার শ্রেষ্ঠ পরিচয়। এরই ছায়ায় একদিন যীশুকে কোলে নিয়ে বিশ্রাম করেছিলেন কুমারী মাতা মেরী। আর এরই সামনে দাঁড়িয়ে একদিন সেনাবাহিনীকে উৎসাহ দিয়েছিলেন

কালজয়ী নেপোলিয়ান: Soldiers of France, forty centuries are looking down upon you.

দোভাষী বলল: এবারে সেরাপিয়াম দেখতে চল।

সেরাপিয়াম কি?

দোভাষীর মুখে আমার প্রশ্ন শুনে খিল খিল করে হেসে উঠল সাদিয়া। বলল: ছি ছি পশুদের সমাধিক্ষেত্রের নাম শোন নি?

বললুম: পশুদেরও আবার কবর হয় নাকি?

এরা কি সাধারণ পশু? এরা সব মেম্‌ফিসের দেবতা, তার বাহন ষাঁড়। দেশের লোকেরা এদের পুজো করত, তারপর কবর দিত মানুষের মতো।

আমরা চলেছিলুম সেরাপিয়ামের মাঝখানের রাস্তা ধরে। চলতে চলতে দোভাষী বলল: এখনও এখানে চব্বিশটি ঘর আছে। লোকে বলে, এই সব ষাঁড়ের সমাধির ওপরেও এক সময় মন্দির ছিল। আজ আর কিছুই নেই।

মেবা আর টির মস্তাবাও দেখলুম আমরা। বড়লোকেব কবরকে এরা মস্তাবা বলে। দেওয়ালে যে কত ছবি আঁকা আছে তার শেষ নেই। সেকালের জীবনযাত্রার আর রীতিনীতির সব কিছু চিত্র এরা দেওয়ালে এঁকে রেখেছে, কৃষিকার্য থেকে নৌকানির্মাণ পর্যন্ত।

হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলুম। একটুখানি ছায়া দেখে বললুম: এসো, এই ছায়ায় খানিক বসি। আর চলতে পাচ্ছি না।

সম্মতির অপেক্ষা না করেই আমি বসে পড়লুম। সাদিয়া হেসে উঠল খিলখিল কবে। বলল: কী রকম পুরুষ মানুষ রে! এইটুকুতেই দম ফুরিয়ে যায়!

আমার লজ্জা এল না, বললুম: ও বয়সে আমারও দম ছিল।

গল্পেও সাদিয়ার ক্লান্তি নেই। কোথা দিয়ে বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যে হল টেরই পেলুম না। হিমেল হাওয়া হাড়ে লাগতেই ফেরার কথা মনে এল। বললুম: কাল আর আসব না।

সাদিয়া হাঁসল।

বললুম: ভাবছ, না এসে পারব না, এই তো?

এবারেও সাদিয়া হাসল।

দোভাষী বলল: সত্যি কথা। ও টানলে আসতেই হবে। মেয়েটা জাহু জানে কিনা!

হেসে বললুম: জাহুই জানে বটে।

*

বাড়ি ফিরতেই আনওয়ার চেপে ধরল, বলল: আবার গিয়েছিলে সেখানে?

চুপ করে থেকে রেহাই পেলুম না। বলল: সত্যি কথা বল।

মিথ্যে আমি বলি না। কালকের মতো সব কথাই অসঙ্কোচে জানিয়ে দিলুম।

আনওয়ার কোনও কথা কইল না, শুধু আমাদের দর্শনের অধ্যাপক ডক্টর সাব্‌রীর মতো গম্ভীর হয়ে গেল। তার চোখের দৃষ্টিতে যেন দুর্ভাবনার ছায়া দেখলুম।

সকালবেলা চায়ের টেবিলে আনওয়ার কথা বলল: তোকে আমি শুধু স্নেহই করি না, নিজের ভাইএর মতো দেখি। বিদেশে আমার চোখের সামনে তুই ভেড়া বনে যাবি, এ আমি কিছুতেই সইতে পারব না।

আমি প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলুম। থামিয়ে দিয়ে আনওয়ার বলল: কোনও প্রতিবাদ এর নেই। মিশরকে চিনতে তোর সারা জীবন কেটে যাবে। এ দেশের পথে ঘাটে মরু-প্রান্তরে আজও সব ডাইনীরা ছড়িয়ে আছে। এদের হাতে পড়ে কত বিদেশীর সর্বস্ব গেছে, তা তুই জানিস নে। মিশরের সমস্ত মেয়েকে আমি ভয় পাই। মনে হয়, ভেড়া বানাতে জানে না এমন মেয়ে বুঝি এ দেশে জন্মায় না।

আনওয়ার উত্তেজিত হয়ে উঠল। কিন্তু আমি ভয় পেলুম না। কবে

কোন্ যুগে এ দেশে ডাইনি ছিল, সেই কথা ভেবে সাদিয়ার মতো সরল মেয়েকেও সন্দেহ করব! আনওয়ার কি পাগল হল? স্পষ্টভাবে এই কথাই তাকে জানিয়ে দিলুম, বললুম: তুই কি পাগল হলি যে কুসংস্কারে বিশ্বাস করছিস?

পাগল আমি, না তুই? মিশরের মাটিতে দাঁড়িয়ে ডাইনীকে যে কুসংস্কার ভাবে, আমি তাকে সুস্থ ভাবব! আমার মাথা তো খারাপ হয় নি!

হেসে বললুম: ওইটেই তো পাগলের লক্ষণ। নিজেকে ছাড়া আর সবাইকে পাগল ভাবে।

আনওয়ার এবারে সত্যিই রাগল, বলল: তোর সঙ্গে পাগলে তর্ক করে। আমি চললুম আমার কাজে।

যাবার সময় পিছন ফিরে বলে গেল: দোহাই তোর, আজ আর যাস নে ওদিকে।

অনুরোধে আর্দ্র হল তার কণ্ঠস্বর।

প্রতিজ্ঞা করে পথে নামলুম, আজ আর মীনায় যাব না।

কিন্তু যাই কোথায়! যা কিছু ছিল কায়রো আর তার উপকণ্ঠে, সবই তো দেখা হয়ে গেছে।

ক্রুসেড-খ্যাত সালাদিনের দুর্গ দেখেছি, দেখেছি তার ভিতরের হলদে অ্যালাবেস্টারের মসজিদ। বাতির অমন জাঁকজমক আর কোথাও দেখি নি। গত শতাব্দীতে মহম্মদ আলি এই মসজিদ নির্মাণ করেন। শোনা যায়, তিনি নাকি তাঁর চার শো সত্তর জন মামেলুক বন্ধুকে নির্মমভাবে হত্যা করেছিলেন এই দুর্গের ভিতর।

আরব স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন সুলতান হাসানের মসজিদ দেখেছি। নগর প্রাচীরের বাহিরে কালিফ্‌দের কবরও দেখেছি। বারোটি কবর-মসজিদ কাছাকাছি ছড়িয়ে আছে।

কিন্তু এ কী করছি আমি? গিজা থেকে আবার যে মীনার

গাড়িতেই উঠে বসেছি! নেমে পড়ব? কিন্তু নামিই বা কী করে। গাড়িই তো শুধু ছুটছে না, মনটাও ছুটছে। দেহটাও দেখছি অচল হয়ে গেছে। মনে হল, আমার হাত-পা, আমার মন-বুদ্ধি কিছুই যেন আর আমার বশে নেই। কোন অদৃশ্য শক্তি তাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছে। এক সময় মীনাতেই পৌঁছে গেলুম।

সাদিয়া যেন আমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল। একটুখানি দুষ্টু হাসি হেসে আমায় অভ্যর্থনা করল। মনে হল যেন দৃষ্টি দিয়ে বলল: কেমন, এলে না আবার?

এখন বুঝতে পারলুম, দোভাষী কাল ঠিকই বলেছিল। ও টানলে না এসে উপায় নেই। কিন্তু সে ছোকরাটা আজ কোথায়? চারিদিকে চেয়ে তাকে আজ দেখতে পেলুম না। সাদিয়া আবার হাসল।

কেন হাসল, খানিকক্ষণ পরেই তা বুঝতে পারলুম। আজ আমরা পরস্পরের ভাষা কতকটা বুঝতে শিখেছি। বোঝবার আর বোঝাবার ক্ষমতা তারই একটু বেশি। আর আমাদের মন আজ দোভাষীর কাজ করছে।

বললুম: সত্যিই তুমি জাদু জান।

সাদিয়া এমন করে হাসল যে তার সমর্থন পেয়ে গেলুম। বললুম: আর কতদূর আমায় নিয়ে যাবে?

এবারেও হাসল সাদিয়া। এই তো শুরু, এমনি এক ইঙ্গিত পেলুম সেই হাসিতে।

সাদিয়া আজ আমায় পিরামিডের ধারে আনল না। বাজার পেরিয়ে একটা ছোট গলি দিয়ে একখানা পুরনো জীর্ণ বাড়ির সামনে এনে হাজির করল। যা বলল তা বুঝতে পারলুম। এ তাদের বাড়ি।

ভিতরে ঢুকে তার মাকে দেখতে পেলুম। ঘরের কাজে ব্যস্ত হয়ে আছেন। সাদিয়া তার বাবার কথাও বলল। বুঝতে কষ্ট হল না যে তিনি তাঁর কাজে বেরিয়েছেন। বাড়ি ফিরবেন সন্ধ্যেবেলায়।

আমাকে একটা চৌকিতে বসিয়ে সাদিয়া তার মায়ের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিল। আমি চারিদিক দেখতে লাগলুম।

হঠাৎ একটা জন্তু দেখে চমকে উঠলুম। ভেড়ার আকৃতি, কিন্তু মাটির পুতুলের মতো প্রাণহীন। বিদ্যুতের মতো ঝিলিক দিয়ে গেল আনওয়ারের কয়েকটা কথা : ভেড়া বানাতে জানে না, এমন মেয়ে বুঝি এ দেশে জন্মায় না। মনে হল, আমারই মতো কোন হতভাগ্যকে সাদিয়া ভেড়া বানিয়ে রেখেছে। এবারে আমার পালা। কানের পাশ দুটো গরম হয়ে উঠল, আর এই শীতের দিনেও ঘামতে শুরু করল আমার সারা শরীর।

ও পাশ থেকে খিলখিল করে হেসে উঠল মোহিনী সাদিয়া। সেই হাসিতে আমার বুকের ভিতরটা শুদ্ধ কেঁপে উঠল। তবে কি সত্যিই সাদিয়া—

আর ভাবতে পারলুম না। লাফিয়ে উঠলুম চৌকি ছেড়ে। সাদিয়া দেখতে পেয়েছিল, ছুটে এসে চেপে আমায় বসিয়ে দিল। বলল : ভয় পাচ্ছ মমি দেখে ?

ওটা মমি নাকি ?

মমিই তো। বালির ভিতর কুড়িয়ে পেয়েছি আমি।

কী সাংঘাতিক !

না না, খুব ভাল মমি এটা। আমার সব কথা শোনে।

কিন্তু তা কী করে হবে ? ওদের শান্তি ভঙ্গ করলে তো উপদ্রব করে শুনেছি।

তাই তো নিয়ম। সবাই এটাকে গোর দিতে বলছে।

দিচ্ছ না কেন ?

কী দরকার ! ও ভাল ছাড়া তো মন্দ করে না। এই দেখো না, কেমন ভাব করিয়েছে তোমার সঙ্গে।

জানি না, তার সব কথা ঠিক বুঝতে পাচ্ছিলুম কিনা। কিংবা তার উত্তরটা হয়তো নিজের মনের মতো করেই গড়ে নিচ্ছিলুম।

সে যাই হোক, ভয় খানিকটা কমে গেল। আবার সহজ হয়ে বসলুম।

সাদিয়া বলল: অনেকদিন হোটেলে খাইয়েছ, আজ আমাদের বাড়িতে খাবে।

বললুম: সে কী, আমার জন্যে কেন কষ্ট করবে?

কষ্ট কি, কষ্ট হয়তো তোমার হবে। জান তো, আমরা বড় গরিব। হোটেলের মতো ভাল খাবার আমরা কোথায় পাব!

তাতে তো প্রাণ নেই।

আমি জবাব দিলুম।

আজও অনেক রাত হয়ে গেল। হাসিতে গল্পে আনন্দে ও বেদনায় কেমন করে যে সারাটা দিন কেটে গেল, অন্য দিনের মতো আজও তা টের পেলুম না।

বাজারের কাছে পৌঁছে সাদিয়াকে বিদায় দিলুম। বললুম: এটুকু পথ আমি একাই যেতে পারব।

কাল আবার আসবে তো?

বললুম: না, কাল আমার দেশে ফিরে যাবার দিন।

সত্যি?

বড় বড় চোখ তুলে সাদিয়া আমার দিকে তাকাল।

আমি জবাব দিলুম: সত্যি।

কেমন একটা ব্যথায় টনটন করে উঠল আমার গলার ভিতরটা।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সাদিয়া বিদায় নিল। যা বলে গেল, তার ধ্বনিটি কানে লেগে রইল গানের কলির মতো।

শুধু কয়েকটি মুহূর্ত। তার পরেই বুকের ভিতর থেকে ভয় উঠল ঠেলে। সাদিয়ার মমিকে আর আমি ভয় পাই নে। ভয় আনওয়ারকে। তার চেয়ে বেশি ভয় তার বেগম সাহেবাকে। সে মহিলাকে আজও আমি দেখি নি, কিন্তু অন্তঃপুরে তাঁর শাসন শুনেছি। নেপথ্যে থেকে নিজের কণ্ঠ দিয়ে অনুপস্থিতির অসৌজন্য রেখেছেন ঢেকে। আজও এত

রাতে বাড়ি ফিরলে আনওয়ারকেও যে আজ রাস্তায় রাত কাটাতে হবে, তাতে আমার সন্দেহ নেই।

সামনে দিয়ে গিজার শেষ গাড়ি ছেড়ে গেল। উঠতে পারলুম না। উঠতে সাহস হল না। কিন্তু এখানে কোথায় থাকব? মাত্র এই কটা দিনের পরিচয়ের দাবি নিয়ে সাদিয়াদের বাড়িতে থাকা চলে না। আর সেখানে থাকবারই বা জায়গা কোথায়? হোটেলে স্থানাভাব আজ কদিন ধরেই দেখছি। আরও একটা ভয় আছে সেখানে। নিজের গাড়ি হাঁকিয়ে আনওয়ারের সেখানে এসে পড়াও বিচিত্র নয়।

একটা অদ্ভুত ফন্দি এল মাথায়। পিরামিডের ভিতরের সেই অন্ধকার গলি-পথটার কথা মনে পড়ল। এমন নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের কথা এতক্ষণ কেন মনে এল না, এই ভেবে আশ্চর্য লাগল। সেইখানেই শুতে গেলুম।

পৃথিবীর এ অংশটা যেন মরে গেছে। অন্ধকারে থমথম করছে চারিদিক। দেশলায়ের কাঠি জ্বেলে জ্বেলে সেই গলির মুখে এসে পৌঁছলুম। ভিতরে ঢুকতে সাহস হল না।

উত্তর থেকে হিমেল হাওয়া এসে নির্দয়ভাবে প্রহার শুরু করে দিল। অনেক ভয়ে অনেক সঙ্কোচে খানিকটা এগিয়ে নিজেকে রক্ষা করলুম।

গোটা চারেক কাঠি একসঙ্গে জ্বেলে চারদিকে ভাল করে দেখে নিলুম। ভয় পাবার মতো কিছুই দেখলুম না। ভয় তবু গেল না। দেওয়ালে হেলান দিয়ে শুয়ে মনে হল, যেন একটা অতিকায় মানুষের পেটের ভিতরে শুয়ে আছি, সারারাত্রি ধরে একটু একটু করে সে আমায় হজম করে ফেলবে। কাল সকালে আর আমাকে কেউ দেখতে পাবে না।

মনে হল, পাশের একটা গোপন কক্ষে আরও একটা মানুষ শুয়ে আছে। সোনার খাটে কিংখাবের গালিচায় তার শয্যা। মণি-মুক্তার

ঝালর ঝুলছে উপর থেকে। আর বিলাসব্যসনের সকল সরঞ্জাম সাজানো তার চার পাশে। জীবনে যা কিছুর প্রয়োজন হতে পারে কোন একটি মুহূর্তের জন্য, তারও ব্যবস্থা আছে সেখানে। কিন্তু আমার মতো হতভাগ্য নয়। সে মিশরেরই কোন রাজা। পাঁচ হাজার বছর ধরে সুখে নিদ্রা যাচ্ছেন পিরামিডের এক গোপন প্রকোষ্ঠে।

জানি না, কেন ভয় পেয়ে পালিয়ে এলুম না! ভয়ও বুঝি অভ্যস্ত হয়ে যায়। কত অদ্ভুত আজগুবি কথা আমার মনে এল। রাজা কি নাচ গান ভালবাসতেন না? আমাদের দেশে শুনেছি, গান শুনতে শুনতে রাজারা ঘুমিয়ে পড়তেন। আবার গানের সুরেই তাঁদের ঘুম ভাঙত। কেন জানি না, আমি উৎকর্ণ হলুম। মনে হল, কান পেতে থাকলে কিছু শুনতে পাব। গানের কলি কিংবা নূপুরের নিক্কণ। ইচ্ছে হল, আমারও ঘুম আসুক আমাদের দেশের সেই সব রাজাদের মতো।

গানের সুর এল না। সারারাত ধরে এল শীতের দুরন্ত বাতাস। ঘন ঘন সিগারেট পুড়িয়েও শরীরকে আর গরম রাখতে পারলুম না। ভয় হল, জমে বরফ হয়ে যাব। কাল সকালে পিরামিড দেখতে এসে মানুষের বদলে এক তাল বরফ দেখবে সবাই। মাটিও কি জমে বরফ হয় রাতে?

এক সময় দেখলুম, রাত্রি প্রভাত হয়েছে। বাইরে বেরিয়ে দেখি, সকালের স্নিগ্ধ রোদে ঝলমল করছে পূবের আকাশ। আমি জানি, আমার বিদায়ের দিনটিতে আনওয়ার আমাকে বকবে না। বেগম সাহেবাও বোধ হয় তাঁর বলার কথা সারারাত বলে নিঃশেষ করে ফেলেছেন। ক্লান্ত কণ্ঠে নতুন কিছু বলার আর উৎসাহ পাবেন না। ভাল লাগল আজকের সকালটি।

সাদিয়াকে একবার দেখে যাব কি? এ দেশ ছেড়ে যাবার আগে শেষ দেখা! গায়ের ধুলো ঝেড়ে সাদিয়ার বাড়ির দিকেই রওনা হলুম।

পথ চলতে একটা নতুন ভাবনা এল মনে। কেন আমাকে আজ দেশে ফিরে যেতে হবে? নাইবা ফিরলুম আজ, নাইবা ফিরলুম আর। দেশে কে আছে আমার পথ চেয়ে? বুড়ো মা বাবাই তো! আরও ছেলে আছে তাঁদের। আমার সাদিয়া নেই সেখানে। নিজের বুদ্ধিহীনতার জন্য করুণা হল নিজের উপরে। এই সহজ কথাটা এতক্ষণ আমার মাথায় আসে নি। চেষ্টা করলে আনওয়ার কি আমায় একটা চলনসই কাজ জুটিয়ে দিতে পারবে না এ দেশে? আজই তাকে বলে দেখব।

কিন্তু সাদিয়ার বাড়ি পৌঁছে পৃথিবীটা শূন্য দেখলুম। সাদিয়া বাড়ি নেই, তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না সেই দোভাষী ছোকরাটিকেও। সাদিয়ার মা কাঁদতে বসেছেন দাওয়ায় পা ছড়িয়ে, আর পুলিশে সংবাদ দিতে গেছেন তার বৃদ্ধ বাবা।

সাদিয়ার ঘরের কোণে সেই ভেড়ার মমিটা আজও তেমনই করে চেয়ে আছে। আমাকেও সে ভেড়া বানিয়ে গেল। ঠিকই বলেছিল আনওয়ার: ভেড়া বানাতে জানে না এমন মেয়ে বুঝি এ দেশে নেই।

কোন দিকে দৃক্‌পাত না করে মীনার বাজারে ফিরে এলুম। সিগারেটের কেসে তখনও একটা সিগারেট ছিল। সেইটে ধরিয়ে গিজার গাড়িতে চেপে বসলুম।

মীনার পিরামিড মিলিয়ে গেল চোখের সামনে থেকে। সেই আরবী লেখকের কথা মনে পড়ল: যে কালকে জগৎ ভয় করে, সেই কালও ভয় পায় পিরামিডকে। আজ মিথ্যা মনে হল তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী। আমার দৃষ্টির সামনে থেকে মীনার পিরামিড মুছে গেল চিরদিনের মতো, হয়তো স্মৃতির জগতেও আর তার কোন স্থান রইল না।

সাদিয়ার খবর পেয়েছিলুম বম্বে পৌঁছে।

আনওয়ারের এয়ার মেলের চিঠি আগে এসে পড়ে ছিল। লিখে ছিল, সাদিয়া ভাল আছে। আবার কখনও মীনায় গেলে সেই পিরামিডের নিচেই তাকে দেখতে পাব।

মনে হল, এ সবই তার কারসাজি।

কিন্তু সাদিয়ার শেষ কথাটি কি বুঝতে পেরেছিলুম!

মনে পড়ল, মানে বুঝিনি তার। শুধু ধ্বনিটি কানে লেগেছিল গানের কলির মতো।

আজও আছে। সাদিয়ার কথা মনে হলে আজও একটা দীর্ঘশ্বাস ঠেলে ওঠে আমার বুকের ভিতর থেকে।

দুই

ভূবিদ্যা পড়েছিলুম ছাত্র জীবনে। সে কাজেও কোথায় না গিয়েছে। রাজপুতানার মরুভূমির ভিতর জলের চেষ্টায় বালি খুঁড়েছি দিনের পর দিন। এক জায়গায় নয়, একশো জায়গায়। কোথাও জল পেয়েছি, কোথাও পাইনি। তখন আশে পাশের গ্রাম থেকে ছেলেমেয়ে, বুড়ো এসে ভিড় করে কাজ দেখত। তাদের চোখে দেখেছি উজ্জ্বল দৃষ্টি, চাতকের মতো তারা জলের জন্য চেয়ে থাকত। আমি তাদের প্রাণ ভরে দেখতুম, তাদের আগ্রহ দেখতে আমারও ভাল লাগত। পৃথিবীতে যে মানুষ আছে, সুস্থ সবল প্রাণবন্ত মানুষ, তাই দেখে সান্ত্বনা পেতুম প্রাণে।

উড়িষ্যার শুকনো মাটির তলায় সোনার সন্ধান করেছি কতদিন। কেওনঝড়ের জঙ্গলে ঝাড়ে, সুবর্ণরেখার ধারে ধারে কত শ্রান্ত রাত্রি যাপন করেছি। সেখানেও মানুষ ছিল, কত বিচিত্র নরনারী। তাদের মুখের ভাষা বুঝিনি, জেনেছি তাদের অন্তরের কৌতূহল। মাটিতে যাদের সোনা ফলে, তাদের মাটির নিচেই তো সোনা আছে। সেই সোনার বাঙলা ফেলে উড়িষ্যায় কেন সোনা খুঁজি, সেই ভেবে আশ্চর্য হত তারা। আমি সুবর্ণরেখার বালিতেও সোনা দেখতুম। মানুষও তো সোনা, সোনা মানুষের মন।

কত বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছি আসাম আর ব্রহ্মদেশের সীমান্তে তেলের অন্বেষণে। ভারতে তেলের চাহিদা বাড়ছে প্রতিদিন, কিন্তু সেই তেল আসছে ব্রহ্ম থেকে, আসছে বাকু থেকে। আসামের তেল আর কতটুকু ক্ষুধা মেটাতে পারে! সেখানেও অশিক্ষিত নরনারী ভিড় করে আসত কাজ দেখতে। তাদের চোখেও স্বপ্ন দেখেছি, নতুন জীবনের স্বপ্ন। তেলের সন্ধান পেলে তাদেরও অন্নের সংস্থান হবে। বড় দরিদ্র দেশ! কোম্পানী পয়সা না ছড়ালে পরিশ্রমের পয়সায় তাদের পেট চলেনা। ভারতের পূর্ব-প্রান্তে এরাই সঙ্গ দিয়েছে আমাকে।

পশ্চিম প্রান্তে তা হল না। গন্ধক কাটতে উঠেছিলুম বেলুচিস্থানের বোঁজা আগ্নেয়গিরির উপর। গন্ধকের পাহাড়ে নেই মানুষের বাস, নেই ক্ষেত খামার গ্রামের চিহ্ন। আগ্নেয়গিরির মতো দেশটাও যেন মরে আছে। মনে হবে, গৌরীশঙ্করের মাথাটা যেন রাতারাতি পাথর হয়ে গেছে। লাঠির খোঁচায় আর বরফের কুচি ছড়ায় না, আগুনের ফুল্‌কি বেরোয়। বুকের উত্তাপে বরফ গলে না, আগুন জ্বলে।

জাপানযুদ্ধের কথা। পূর্ব দিগন্তে জাপানের বিরাট হাঁ-এর ভিতর গোটা দেশটাই বুঝি ডুবে যাবে। উড়োজাহাজে উড়ে এসে বোমা ফেলে যাচ্ছে যেখানে সেখানে। লড়াই শেষ হবার লক্ষণ নেই, দেশের গন্ধক গেল ফুরিয়ে। ইংরেজ সরকারের হুকুম হল, যেখান থেকে পার গন্ধক আনো। বারুদের কারখানা বন্ধ হবার আগে গন্ধকের পাহাড় পৌঁছে দিতে হবে তার দরজায়। উনিশ শো বিয়াল্লিশের নভেম্বর মাসে আমরা বেলুচিস্থানের মরা আগ্নেয়গিরিতে উঠলুম গন্ধক কাটতে।

ব্র্যাড্‌শর টাইমটেবলে পথের নির্দেশ দেখেই আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়েছিল। সেই মোটা বইখানার পাতাতেই দুর্গমতার সঙ্কেত পেয়েছিলুম। কোয়েটা থেকে বড় লাইন গেছে ইরাণের সীমান্ত জাহিদান। সপ্তাহে একখানা ট্রেন যায় আর একখানা আসে। যতদূর

মনে পড়ে, সে সময় কোয়েটা থেকে ট্রেন ছাড়ত প্রতি মঙ্গলবার, আর জাহিদান থেকে শুক্রবার। এই লাইনের উপর নোক কুণ্ডি নামে একটা ছোট স্টেশন আমাদের গন্তব্য স্থান, কোয়েটা থেকে প্রায় সাড়ে তিনশো মাইল পশ্চিমে। সকাল দশটার কিছু আগে কোয়েটা ছেড়ে পরদিন সকাল সাড়ে সাতটার পর এই স্টেশন পৌঁছত। যাত্রীর মতো মালপত্রও ওঠানামা করত, গাড়ি কাটাজোড়া হত, একটা স্টেশনে এলে আর ছাড়তে চাইত না।

জাহিদানও যে নোক কুণ্ডির কাছে নয়, তা বুঝতে পারা যায় ট্রেনের গতিবিধি দেখে। মঙ্গলবার সকালবেলা কোয়েটা ছেড়ে যে ট্রেন বুধবার সকালে আসত নোক কুণ্ডি, সে ট্রেন বৃহস্পতিবারের আগে জাহিদান পৌঁছত না। পৌঁছলে শুক্রবারের আগেই ছাড়ত। টাইম টেবলে অবশ্য বুধবার রাতে পৌঁছয় বলে লেখা থাকত। আর এই দীর্ঘ পথের মাঝে দেখতুম দুটি মাত্র স্টেশন।

জাহিদান শুনেছি খুব বড় জায়গা। ভারতবর্ষে নয়, আফগানিস্থানে নয়, জাহিদান ইরাণে। বেলুচিস্থানের মানচিত্রকে যদি একটা খরগোসের সঙ্গে তুলনা করা যায়, তো তার উপরের কানের ডগা ঘেঁষে আছে জাহিদান। ইরাণের অন্তর্গত হলেও ভারত আর আফগানিস্থানের সীমান্ত যেন ছুঁয়ে আছে। কন্যাকুমারীতে যেমন তিন সমুদ্রের মিলন, তেমনই তিন দেশের মিলন এই জাহিদানে।

পৌষের এক কুয়াশাচ্ছন্ন সকালে আমরা নোককুণ্ডিতে নামলুম। ঘড়িতে তখন সকাল হয়েছিল বটে, অন্ধকার জমে আছে কুয়াশার মতো ঘন হয়ে। এবারে আমি একা নই, ছোটখাট একটি দল। দরিদ্র দেশবাসীর জীবনযাত্রার গতানুগতিক প্রয়োজনে আজ আসিনি, এসেছি সরকারের জীবন-মরণের সমস্যার সাহায্য করতে। অনুগ্রহ করতে নয়, অনুগৃহীত হতে। গন্ধকের বিষাক্ত ধোঁয়ায় অসুস্থ হয়ে আমার পূর্বতন সহকর্মী পালিয়ে আত্মরক্ষা করেছেন। কয়েকজন সহকারী কর্মীও পালিয়েছেন, আমরা এলুম তাঁদের শূন্য স্থান পূরণের

জন্য। নিষ্ঠার সঙ্গে নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদন করে গেলে সরকারের অনুগ্রহভাজন হব এই ভরসা।

স্টেশনের বাহিরে গোটা দুই ল্যাণ্ড-রোভার ছিল আমাদের অপেক্ষায়। একজন কর্মীও এসেছিল আমাদের নিতে। প্যাণ্টের পকেট থেকে কোনরকমে হাত দুখানা বার করে একটা নমস্কার করল, তারপর যথাস্থানে সে দুখানা স্থাপন করে প্রশ্ন করল: পথে কোন কষ্ট হয়নি তো সার?

কষ্ট যা হয়েছিল তা শীতে, এখানেও সেই শীত। প্যাণ্টের পকেট থেকে হাত দুটো বেরোল না, মাথা নেড়ে নমস্কারের জবাব দিলুম। বললুম: কষ্ট আর কী, শীতে ঘুমের একটু ব্যাঘাত হয়েছিল মাত্র।

নূতন কর্মীরা আমার পিছনেই ছিল। তাদের একজন বলল: একটু কেন বলছেন সার, দুচোখের পাতা যে খানিকক্ষণের জন্যেও এক করা গেল না।

কথাটা মিথ্যা নয়। লেপ-কম্বল মুড়ি দিয়ে সারারাত কেঁপেছি। গাড়ির সমস্ত কাচ আর খড়খড়ি ফেলে দিয়েও ঠাণ্ডা হাওয়াকে আটকাতে পারা যায় নি।

পুরনো কর্মীটি হাসল, হেসে বলল: সমুদ্রতল থেকে এ জায়গাটা দু-আড়াই হাজার ফুট উঁচুতে। আমাদের কহ্-ই-সুলতানের বেস ক্যাম্প পাঁচ হাজার ফুটে, আর মিরি ক্যাম্প বোধ হয় সাত হাজার।

তার ঠোঁটে বিদ্রূপ প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে দেখলাম। আড়াই হাজার ফুটেই আমরা আড়ষ্ট হয়ে আছি, গন্ধক কাটব তো সাত হাজার ফুটের উপর। সেই কথা স্মরণ করিয়ে দেবার সময়ে যেন আমাদের পৌরুষের প্রতি কটাক্ষ করল এই পুরনো কর্মীটি।

একটি জিনিস জীবনে সহ্য করিনি, সেটি আমার অক্ষমতার প্রতি খোঁটা। যা দশজনে পারে, তা আর দশজনে পারবে না কেন। সম্ভব কাজ না পারলেই লোকে খোঁটা দেয়। কহ্-ই-সুলতান তো কাঞ্চনজঙ্ঘা নয়, না হয় শীতের দার্জিলিঙই হল। দার্জিলিঙের সব

লোকই শীতের ভয়ে পালিয়ে যায় না। পকেট থেকে রুমাল বার করে নিজের নাকের ডগাটা একবার মুছে নিলুম, বললুম: মালপত্রগুলো উঠিয়ে দাও গাড়িতে, সকাল সকাল রওনা হয়ে পড়ি।

সিংহের মতো কেশর নেড়ে আমি এগিয়ে গেলাম। মনে হল, পিছনে আমাদের কর্মীরাও আমার এই সাহসের পরিচয় পেয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে।

জনকয়েক বেলুচ কুলি আমাদের মালপত্র গাড়িতে তুলে দিল। তাদের পয়সা দিতে যাচ্ছিলুম, বাধা দিয়ে আমাদের পুরনো কর্মীটি বলল: ওদের আর পয়সা দিতে হবে না সার, ওরা আমাদেরই কুলি।

আমি অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চাইলুম। সে বলল: মিথ্যে নয় সার, এখানে আর কুলি পাওয়া যাবে কোথায়? এইটুকু তো স্টেশন!

স্টেশন ছোটই বটে, স্থানটি আরও ছোট। দিগন্ত বিস্তৃত মরুভূমির মাঝে একটুখানি শ্যামলিমা। চারিদিকের কুয়াশা ভেদ করে যে কখানা ঘরবাড়ি দেখতে পেলুম, তাতে মনে হল, ছোট বাচ্চা কাচ্চা মিলিয়েও শ খানেক লোক হবে কিনা সন্দেহ। ঐশ্বর্যের চিহ্ন নেই কোনদিকে, আছে একটা নির্লিপ্ততা, দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধে হেরে যাবার পরের নির্জীব প্রশান্তি।

আমার বিস্ময় লক্ষ্য করে সেই কর্মীটি আবার বলল: আমাদের দু-আড়াইশো কুলি, তাদেরও ধরে আনতে হয়েছে অন্যখান থেকে।

সত্যিকথা, এখানকার লোকের আছে বালিতে ভরা সামান্য জমিজমা, যেখানে বুকের রক্ত ঢেলে বছরের খাবার তুলতে হয় ঘরে, তাও পেট ভরা খাবার নয়। সেই জমি ফেলে পাহাড়ে উঠলে প্রথমটা চলবে ভাল, সরকার খেতে দেবে, কিন্তু ভবিষ্যৎ? গন্ধক কাটা তো চিরদিন চলবে না! আর ফসলই যদি না ফলল ক্ষেতে, তাহলে পয়সা দিয়ে তো এই মরুভূমির দেশে পেট ভরবে না! বরং

খেটে খুটে চারটি বেশি গম তুলতে পারলে, তাতেই আসবে পয়সা। বাহিরে থেকে গন্ধক কাটতে যারা আসবে, পেটটা বাড়িতে ফেলে তারা আসবে না। সরকারের মাপা খাবার, দুমুঠো বেশি গমের জন্য তারাও হ্যাংলামি করবে। গন্ধক কাটার আদ্ধেক পয়সা দিয়ে যেতে হবে নোক কুণ্ডির চাষাদের।

সেই কর্মীটি তখনও থামেনি, নূতন লোক পেয়ে অনেক কথা বলছে : এখানকার লোক যে একেবারে নেই, তা নয়। যে পরিবারে দুটো পুরুষ ছিল, তার একটা গেছে। যে পরিবারে একটা, ক্ষেতের কাজ না থাকলে সেও গিয়ে ধর্ণা দিচ্ছে কাজের জন্যে। এরাই বজ্জাত বেশি, এরাই ফোসলায় আমাদের আমদানি করা কুলিগুলোকে। এক সময় কী সৎ ছিল এই লোকগুলো, এখন চুরি করতেও শিখছে এদের পাল্লায় পড়ে।

মবুজত দুখানা ল্যাণ্ড-রোভারে আমাদের তুলে দিল সেই পুরনো কর্মীটি, দিল মালপত্রও সব সাজিয়ে গুছিয়ে। ড্রাইভার দড়িদড়া দিয়ে বেঁধে নিল। আমি ড্রাইভারের পাশে বসেছিলুম, জিজ্ঞাসা করলুম : তুমি ফিরবে না?

উত্তর দেবার সময় এক গাল হাসল ভদ্রলোক, বলল : আমার কি আজ একদণ্ড ফুরসৎ আছে স্যার! আজ গাড়ির দিন, সারাদিন আমার এইখানেই কেটে যাবে।

আমি বেশ একটু বিস্মিত হলুম। ভদ্রলোক আমার বিস্ময় লক্ষ্য করে বলল : আজই তো আমার সত্যিকার কাজ।

বলে ট্রেনের দিকে দেখিয়ে দিল। গাড়ি তখনও দাঁড়িয়ে আছে। বলল : ঐ যে ট্যাঙ্ক ওয়াগনগুলো দেখছেন, ওর একটাতে আমাদের জল আসে ডাল্‌বল্‌দিন থেকে।

জল নেই এখানে?

ভদ্রলোক হেসে বলল : গন্ধক ছাড়া আর তো কিছু আছে বলে জানিনে।

খানিকটা তফাতে একখানা লরির মতো দাঁড়িয়েছিল। সেইটে দেখিয়ে বলল : ঐতো আমাদের ওয়াটার কেরিয়ার। ওতে জল ভরে আমি ক্যাম্পে নিয়ে যাব। রেল কোম্পানি এই জলটুকু নিয়মিত এনে দিচ্ছে বলেই আমরা বেঁচে আছি, নইলে জলের অভাবে আমরাও কবে গন্ধক হয়ে যেতাম।

বলে সেই কর্মীটি নিজের রসিকতায় নিজেই হাসতে লাগল।

ধনুষ্কোটির কথা আমার মনে পড়ল। সেখানেও রেলের ট্যাঙ্ক ওয়াগনে মণ্ডপম্ স্টেশন থেকে খাবার জল আসে। ধনুষ্কোটির জল মুখে দেওয়া যায় না, এমনই নোনতা। সমুদ্রের জলের সঙ্গে পার্থক্য নেই এতটুকু। মাদ্রাজ সরকার বললেন, সমুদ্রের ধারে তো অনেক শহরই আছে, কারও জল তো এমন নোনতা নয়। ধনুষ্কোটিতেই বা কেন ভাল জল পাওয়া যাবে না। সেতুবন্ধ রামেশ্বর তো ধনুষ্কোটির গায়ে লেগে আছে, সেখানকার জল কেমন মিষ্টি! কাজেই আমাকে ছুটতে হল কলকাতা থেকে ধনুষ্কোটি। অনেকদিন ধরে অনেক চেষ্টা করে ফিরে এলুম। সেখানকার বালির নিচে নেই সুস্বাদু পানীয় জল। আমার আগে যিনি এখানে ছিলেন, তিনি আমার চেয়ে ঢের পাকা ভূতত্ত্ববিদ। তিনি যখন হার মেনেছেন, তখন এক বরুণদেব ছাড়া আর কেউ সাহায্য করতে পারবেন বলে মনে হয় না।

ড্রাইভার গাড়িতে স্টার্ট দিয়েছিল। ভদ্রলোক তখনও নিচে দাঁড়িয়ে কথা কইবার চেষ্টা করছে। জিজ্ঞাসা করলুম : তোমার নামটা কী?

ভদ্রলোক যেন লজ্জায় মরে গেল। জিভ কেটে বলল : এই দেখেছেন সার, কী ভুলই করে ফেলেছি! কাজের চাপে নিজের পরিচয়টা দিতেই ভুলে গেছি। ঐ আমার একটা বদ অভ্যাস। আমি আপনার স্টোরক্লার্ক, সবাই বলে স্টেশন ক্লার্ক। মানে রেলের চাকর নই, আমি আপনারই স্টাফ। স্টেশন ডিউটিটা আমার বাঁধা, একদিন আপে একদিন ডাউনে। বাকি পাঁচদিন মিরি ক্যাম্পের

স্টোরের কাজ আমার। কী বলব সার, এমন ঝকমারির কাজ আর নেই, আর এই শর্মাই হচ্ছে একাজের একমাত্র লোক। এও দেখে নেবেন আপনি।

তোমার নামটা ?

ভদ্রলোক আর একবার জিভ কেটে বলল: দেখলেন সার, আসল কথাটাই বলতে ভুলে যাচ্ছি বারবার। আমার নাম হল দাস, মানে রতন দাস, সরকারি নাম আর দাস।

গলা নামিয়ে বাঙলায় বলল: ঢাকার বিক্রমপুরে আমার বাড়ি।

ভদ্রলোক ইংরেজীতেই কথা বলছিল এতক্ষণ। কিন্তু তার উচ্চারণের বহর দেখে তাকে বাঙালী বলেই সন্দেহ করেছিলুম। সতর্ক বাঙালী বা মাদ্রাজী যেমন অনুকরণে পটু, অসাবধান হলে তারা তেমনই উৎকট। বিশেষত ইংরেজী ভাষার উচ্চারণ দেখে মনে হয় যেন মাতৃভাষার শাড়ি কেড়ে নিয়ে হাঁটু বার করা স্কার্ট পরিয়েছে তাকে।

ড্রাইভার আস্তে আস্তে চলতে শুরু করেছিল। দাসও চলছিল পাশে পাশে। বললুম: আচ্ছা, তাহলে ক্যাম্পেই আবার দেখা হবে।

আমার সঙ্গে সবাই অবাঙালী কর্মী, তাই ইংরেজীতেই বললুম কথাকটি। ড্রাইভার বোধহয় বুঝতে পেরেছিল, তাই গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিল। নমস্কার করে পেছন ফিরল দাস।

কয়েক গজ পথও আমরা এগোয়নি। পেছনে দাসের চীৎকারে দুখানা গাড়িই ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে গেল। খবরের কাগজের বাণ্ডিলটা সঙ্গে দেওয়া হয়নি, উচ্চৈঃস্বরে জানিয়ে দিয়েই স্টেশনের দিকে ছুটে গেল।

সূর্যোদয় তখনও হয়নি, ঘড়িতে কিন্তু নটা বেজে গেছে অনেকক্ষণ। পিছনে যারা বসেছিল, তারা এই অপূর্ব বিষয় নিয়েই আলোচনা সুরু করেছে।

পথের ধারে গোটাকয়েক উট শুয়ে বসে ছিল। তাদের দুটোর পিঠে মালপত্র বাঁধা হচ্ছে দেখলুম। আরোহীরা অপেক্ষা করছে পিঠে চড়বার জন্য। মনে হল, এই গাড়ি থেকে আমাদেরই সঙ্গে তারা নেমেছে। যাবে কোন দূরের গ্রামে, সালোয়ার পরা শক্ত বেলুচ পুরুষ, মেয়েও আছে সঙ্গে। তারাও শক্ত পুরুষদের মতো। সার্টের মতো লম্বা জামার উপর ওড়না ফেলে রেখেছে একটুখানি। চোখেমুখে স্বাস্থ্যের দীপ্তি গালের রঙের মতোই টকটক করছে।

বেশিক্ষণ দাঁড়াতে হল না। দাস ছুটতে ছুটতে এসে খবরের কাগজের বাণ্ডিলটা আমার হাতে দিয়ে গেল।

সাত দিনের কাগজ।—আর কথা বলার মতো দম ছিল না তার।

সূর্য না উঠলেও স্বচ্ছ হয়ে গেছে পূবের আকাশ। কুয়াশায় আর তেমন ঘোর নেই। খানিকটা পথ পার হতেই গাছপালার শ্যামলিমা শেষ হয়ে গেল। গাড়ির চাকার নিচে উড়ল শুকনো বালি। তাও শেষ হয়ে গেল আরও খানিকটা এগিয়ে। চাকার নিচে চাপা পড়ে সেই বালি শক্ত হয়ে গেছে। রুক্ষ কঠিন পথ। উটের পায়ে আর মোটরের চাকায় তৈরি নূতন পার্বত্য পথ। তেইশ মাইলে আড়াই থেকে পাঁচ হাজার ফুট উঠতে হবে বেস ক্যাম্পে, তারপরের দুহাজার ফুট উঠতে হবে দুমাইলে। ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করে এই খবর পেলুম।

একসময় পূবের দিগন্ত উদ্ভাসিত করে সূর্যোদয় হল। আমরা উত্তরে চলেছি। আমার দক্ষিণে সেই অপূর্ব দৃশ্য দেখতে পেলুম। পিছনে কর্মীদের আনন্দ আর ধরে না। পায়ে মোজা হাতে দস্তানা গলার মাফলার খুলে মাথায় জড়িয়েও শীতের হাওয়ায় ঠকঠক করে কাঁপছিল। এইবারে রোদ দেখতে পেয়ে যেন আকাশের চাঁদ পেয়েছে হাতে। পকেট থেকে ঘড়ি বার করে দেখলুম, বেলা প্রায় দশটা বাজে। ট্রেন অনেক লেটে এসেছে আজ, তাতেও এই।

ঠিক সময়ে এলে ঠাণ্ডায় আমাদের কী হত, সেই ভেবে ভয় পেলুম।

সঙ্কীর্ণ পথ দিয়ে আমরা ছুটে চলেছি। বালি শক্ত হয়ে এখানে পাথর হয়ে গেছে। উঁচু নিচু বন্ধুর পথ। পাথর কেটে রোলার চালিয়ে সমতল করবার চেষ্টা করেনি কেউ। লাফিয়ে লাফিয়ে আমরা ছুটলুম।

মাঝে মাঝে হাসির শব্দ পাচ্ছি পিছন থেকে। কখন বাঁকের কাছে গায়ের উপর হেলে পড়ছে একজন, কখন লাফিয়ে উঠতেই মাথা ঠুকে যাচ্ছে আর একজনের। যাত্রার আগে দড়িদড়া দিয়ে মালপত্র কেন বেঁধে নিয়েছিল, এখন তা বুঝতে পারি। না বাঁধলে এক একটা করে মাল পথেই ফেলে আসতে হত।

একসময় আমাদের যাত্রা শেষ হল। বেস ক্যাম্প ছাড়িয়ে আমরা মিরি ক্যাম্পে এলুম। শক্ত কঠিন পাথরের উপর দাঁড়িয়ে পুরনো কর্মীদের অভিনন্দন পেলুম আমরা। পরিচয় শেষ হতে না হতেই নূতন কর্মীরা তর্ক শুরু করল এ স্থানের উচ্চতা নিয়ে। বলল: দু মাইলে দু হাজার ফুট ওঠা দুঃসাধ্য। হিসেবের ভুল কোথাও আছে।

সেকথা সত্য। দু মাইলে দু হাজার ফুট মানে পাঁচ ফুটে এক ফুট ওঠা। তাতে গড়িয়ে পড়ে যাবার সম্ভাবনা। একজন রসিক ছোকরা ছিল পুরনো কর্মীদের ভিতর। বলল: ঠাণ্ডার হিসেবে কখন ভুল হবে না এখানে। এরই মধ্যে পুরু সর পড়ছে জলের উপর, আজকালের মধ্যেই জল যে জমে যাবে তাতে সন্দেহ নেই।

চোখ বড় বড় করে তাকাল নূতন কর্মীরা। উৎসাহ পেয়ে কথাটা শেষ করল সেই পুরানো কর্মী, বলল: গেল বছর ছাব্বিশ ডিগ্রীতে নেমেছিল, এবারে কি আরও বেশি নামবে না?

মূর্ছা যাবার উপক্রম হল নূতন কর্মীদের। একজন রহস্য করে প্রশ্ন করল: হাড় কখানাও বরফ হয়ে যাবে না তো?

সবাই হেসে উঠল তার কথা শুনে।

ততক্ষণে আমার এক সহকর্মী এসে পড়েছেন ঘটনাস্থলে। স্বাভাবিক সৌজন্য বিনিময়ের পর আমাকে টেনে নিয়ে গেলেন তাঁর ঘরের দিকে। নূতন কর্মীরা গেল পুরানো কর্মীদের সঙ্গে।

করগেটেড শীটের ছোট ছোট ঘর। তারই একখানার ভিতর আমায় নিয়ে এলেন আমার সহকর্মী মিস্টার নাথ। গন্ধকের কোয়ালিটি তিনি পরীক্ষা করেন না। তাঁর উপর ভার হল এই ক্যাম্পের শৃঙ্খল কার্য নির্বাহের। হেসে বললেন: এই আমার সংসার।

একখানা হাল্কা ক্যাম্প-খাট, দুখানা ফোল্ডিং চেয়ার আর টেবিল। দেওয়ালে জামা টাঙ্গাবার জন্য হুক। তাতেই ঘর ভরে আছে।

আমার কৌতুক লক্ষ্য করে বললেন: পাশের ঘরে আপনার সংসারও এমনই গোছানো আছে। আপনার আসার সংবাদ পেয়ে ঝেড়ে-মুছে একেবারে ঝকঝকে করে রাখিয়েছি।

একজন বেলুচ ট্রে করে চায়ের সরঞ্জাম দিয়ে গেল, সঙ্গে খান কয়েক পরোটা। দীর্ঘ দেহ কোমর অবধি নুইয়ে এল। অনেক সঙ্কোচ জড়িয়ে আছে তার হাতে পায়ে। দীর্ঘদিনের নোংরামিও লেগে আছে পরনের জামাকাপড়ে। বললুম: নতুন ভর্তি বুঝি?

নাথ বললেন: নতুন কোথায়, গোড়া থেকেই এমনি ভীরু। ভীরুর জাত এরা। এত বড় শরীরে সাহসের অভাব যত, কাজ করবার অনিচ্ছাও তত প্রবল। আমাদের দেশের মজুর হলে কাজ শেষ করে কবে আমরা ফিরে যেতে পারতাম।

চা খেতে খেতে জিওলজিষ্ট মিষ্টার মুখার্জির কথা জানতে চাইলুম। বললুম: এমন সুন্দর সংসার ফেলে তিনি পালিয়ে গেলেন কেন?

নাথ বললেন: পালিয়ে তিনি বেঁচেছেন, পারলে আমিও পালাতাম।

আমি আরও কিছু জানবার জন্য তাঁর মুখের দিকে তাকালুম।

নাথ বললেন : গন্ধকের গন্ধ তাঁর ভাল লাগত, কিন্তু এই ব্যাটাদের নোংরামি তাঁর সহ্য হত না। পালাবার একটা উপলক্ষ্য অনেকদিন ধরেই খুঁজছিলেন। শেষে একদিন সারারাত বৃষ্টিতে ভিজে অসুখে পড়লেন। প্রাণভরে সেই অসুখকে আশীর্বাদ করে ভদ্রলোক পালিয়ে বাঁচলেন।

ইচ্ছে করে ভিজলেন সারারাত ?

ভদ্রলোক যেন উপভোগ করলেন আমার প্রশ্নটা, এমনি ভাবে হেসে বললেন : ভিজেছিলাম আমরা সবাই, আর অসুখেও পড়েছিলাম অনেকে। যারা পালিয়ে গেল, তাদেরই বদলি এসেছেন আপনারা। যে সবচেয়ে বেশি ভিজে সবচেয়ে বেশি ভুগল, সে কিন্তু গেল না।

রহস্যজনক ভাবে হেসে বললেন : সে আমাদের দাস, মানে রতন দাস। রতন মানে কি জুয়েল ?

হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন নাথ।

বললুম : হ্যাঁ।

খুশী হয়ে নাথ বললেন : লোকটা জুয়েলই বটে।

রতন দাসকে দেখবার অনেক সময় পাব। আমি ভাবছিলুম এদের জলে ভেজবার কথা। বললুম : এই ঠাণ্ডার দেশে কেউ সাধ করে জলে ভিজতে পারে ?

নাথ বললেন : সাধ করে কি আর ভিজেছি, ভিজেছি বৃষ্টির জলে। একদিন রাতে আকাশ ফুঁড়ে জল নামল। দেখছেন তো আমাদের ক্যাম্প ? বেশির ভাগই তাঁবু। আমাদেরও তাঁবু ছিল আগে। এই করগেটেড্ বাড়ি নতুন হয়েছে। এখানকার বৃষ্টি আটকায় না কিছুতেই। সারা বছরে এক ইঞ্চি বৃষ্টি হয় বটে এই দেশে, কিন্তু তার ভয়াবহতা জানতাম না। একদিন গভীর রাতে হাওয়া উঠল। সে কী অদ্ভুত শব্দ তার ! বাতাসের শব্দেই সকলের ঘুম ভেঙে গেল। আমাদের স্টোর ছিল করগেটেড শীটের। আশ্চর্য হয়ে দেখলাম,

পোষ্টকার্ডের মতো উড়ে উড়ে আছড়ে পড়ছে চালের শীটগুলো। একসময় বৃষ্টি সুরু হল, সে বৃষ্টি যেন আর থামে না। লেপ কম্বল ভিজে শপশপে হল। ঘরের কোণায় দাঁড়িয়ে অকাতরে ভিজছি আর বাঁশ পাতার মতো পতপত করে কাঁপছে সারা দেহ। যখন জল থামল, ঘরের মেঝেতে তখন চার-পাঁচ ইঞ্চি জল জমেছে।

সারা বছরের জল তাহলে একদিনেই পড়েছে বলুন ?

দুশ্চিন্তার রেশটুকু কণ্ঠস্বরে ধরা পড়ে গেল।

নাথ বললেনঃ বলেন কি, এক ফোঁটাও জল দেখিনি বাইরে বেরিয়ে। বরফ পড়ার দিন আসছে, বৃষ্টিও পড়বে সেই সময়।

কথা শুনে বুকের রক্তও যেন জমে আসে।

হঠাৎ একসময় নাথ জিজ্ঞাসা করলেনঃ কিছু মনে করবেন না, আপনি পূর্ববঙ্গের লোক, না পশ্চিমবঙ্গের।

নাথ নিজে পাঞ্জাবী, ফর্সা ধবধবে গোলগাল ফুলোফুলো চেহারা। বাঙলাও বিভক্ত হয়নি তখনও। পূর্ববঙ্গ পশ্চিমবঙ্গের নাম কোথায় শুনেছেন ভেবে আশ্চর্য হলুম। বললুমঃ পূব-পশ্চিম কোন বঙ্গেরই লোক নই আমি, আমার দেশ উত্তর বঙ্গে।

নাথ বেশ বিস্ময়ে অভিভূত হলেন, বললেনঃ পূর্ব ও পশ্চিম ছাড়া আরও একটা বঙ্গ আছে ?

আগে ছিল না। পূর্ব-পশ্চিমের রেশারেশি যত বাড়ছে, উত্তর বঙ্গের আয়তনও বাড়ছে তত। আমাদের দলে নিতে কেউই রাজী নন। 'ঘটি' আর 'বাঙালে' যখন দ্বন্দ্ব হয়, আমরা 'বাহে'রা দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখি।

নাথেরও মজা লাগছিল। বললেনঃ আপনাদের ভাষা ?

সেও আলাদা। পূর্ববঙ্গের ভাষা যেমন বুঝিনে, তেমনি পশ্চিম বঙ্গের ভাষাতেও কথা কইতে পারিনে। ভাগ্যি ভালো যে বাঙলা শিক্ষার ভাষা একটি, এবং এই সাধু বাঙলা ভাষাটি ধীরে ধীরে

পশ্চিমবঙ্গের ভাষাকেই জাতে তোলবার চেষ্টা করছে। কিন্তু আপনি এত সব জানলেন কোথা থেকে ?

নাথ হেসে বললেন : দাস বলেছে। মুখার্জি সাহেব যখন পালিয়ে গেলেন, তখন তার কাছে এই গল্প শুনেছি। একদিন তাকে ঠাট্টা করে বলেছিলাম, 'তোমার দেশের লোক তো পালিয়ে গেলেন, তুমিও পালাও এবারে।' প্রবল জ্বর নিয়েও দাস তখনও কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। শেষরাতে উঠে ষ্টেশন যাওয়া, খাবার ও জলের ব্যবস্থা করা, হিসেবপত্র রাখা, কিছুই বাদ দিচ্ছে না। আপত্তি জানিয়ে বলল, 'আমার দেশের লোক বলবেন না সার, আমার দেশের লোক হলে পালাতেন না।' আমি সেদিন তার কথা শুনে আশ্চর্য হয়েছিলাম, পরে দাসই আমায় বলেছিল, পশ্চিমবঙ্গের লোক জাত-বাবু, বড়াই নিয়ে বেঁচে আছে। বাংলা বেঁচে আছে পূর্ববঙ্গের লোকের পরিশ্রমে।'

আপনার কী মত ?

অসঙ্কোচে প্রশ্ন করে বসলেন নাথ।

উত্তরটা আমি এড়িয়ে গেলুম, বললুম : এ বিষয়ে কতটুকু আমার অভিজ্ঞতা, সারা জীবনটাই তো বাঙলার বাইরে কাটালাম।

নাথের দেহটা মোটা হতে পারে, বুদ্ধি মোটা নয়। বুঝতে পারলেন যে নিজের দেশের দুর্বলতার কথা প্রকাশ করতে চাইনে। হঠাৎ দেওয়ালের থার্মোমিটারের দিকে চোখ পড়তেই লাফিয়ে উঠলেন তিনি। বললেন : পঞ্চাশ ডিগ্রির ওপর উঠেছে উত্তাপ, আর আমরা এখনও ঘরের ভেতর বসি আছি !

চা খাওয়া আমার শেষ হয়ে গিয়েছিল, আমিও উঠে দাঁড়ালুম।

সত্যিই বাহিরটা তখন নির্মল আলোয় ঝকঝক করছে। তৃণগুল্মহীন রুক্ষ ধূসর পাহাড়, ধরণীর সুধা শ্যামলিমার চিহ্ন নেই কোনখানে। নাথেরও বোধ হয় এই কথা মনে এসেছিল, বললেন : পৃথিবীতে গাছপালা কি এখনও আছে ?

আমি হাসলুম তাঁর কথা শুনে।

নাথ বললেন: এত গন্ধক আমরা পাঠাচ্ছি, এখনও কি সব জ্বলে যায়নি?

দূরে একটা পাহাড়ের চূড়া থেকে অল্প অল্প ধোঁয়া উঠছিল। সেদিকে তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট করে বললুম: ওটা কী?

নির্লিপ্তভাবে নাথ বললেন: ওটা জ্যান্ত আগ্নেয়গিরি, নাম কহ্-ই-তুফ্তান। এই কহ্-ই-সুলতানের মতো ওটা এখনও মরে গন্ধক হয়নি। আমাদের উত্তর পুরুষেরা ওর গন্ধক কাটতে আসবে।

বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

খানিকটা উপরে কুলিরা কাজ করছিল। শ দুই আড়াই বেলুচ পুরুষ, কেউ গন্ধক কাটছে, কেউ ঝুড়ি ভর্তি করে নিচে নামছে। কয়েকখানা লরি দাঁড়িয়ে আছে ওধারটায়, সেই গন্ধক এনে তুলছে লরিতে। বিরাট বলিষ্ঠ পুরুষ মানুষগুলো ছোট ছোট ঝুড়ি মাথায় নিয়ে ধীরে ধীরে নিচে নামছে। যারা গন্ধক কাটছে, একটা ঝুড়ি ভরতে তারা তিনবার বিশ্রাম নিচ্ছে। ফ্লানেলের পাৎলুন পরা কয়েকজন কর্মীকেও দেখতে পেলুম। তৎপরভাবে তারা এদের কাজ পরিদর্শন করছে।

নাথ দেখছিলেন ঐ লোকগুলোকে। হঠাৎ বললেন: আপনাদের দেশের খবর আমি জানি না, কিন্তু আমাদের দেশের মেয়েরাই এসব কাজ বেশি করে। গোটাকয়েক পুরুষ ঝপাঝপ ঝুড়ি ভর্তি করে মেয়েদের মাথায় তুলে দেবে, আর মেয়েরা সারি বেঁধে ছুটবে লরি বোঝাই করতে। ঠিকাদারের কাজ হলে কোঁচড় ভর্তি কড়ি নিয়ে বসবে একজন কর্মচারী। এক একটা ঝুড়ির জন্যে দেবে এক একটা কড়ি। বেশিও পায় এক আধটা সুন্দর মেয়ে।

বলে একটা অর্থপূর্ণ হাসি হাসলেন নাথ সাহেব।

উপরে উঠতে উঠতে বললেন: এ পোড়া দেশে নাকি মেয়েমানুষের অভাব।

হঠাৎ যেন একটা তিক্ততার আভাস পেলুম তাঁর কথায়। বললেন : দেখছেন ঐ পুরুষগুলোকে ? ঐ একটুখানি ঝুড়ি বইতে কতবার দাঁড়াচ্ছে !

কথাটা সত্যি দেখলুম। কেউ দাঁড়িয়ে পড়লেই আমাদের কর্মীরা এসে তার পিঠ থাবড়ে বলছে 'সাবাস সাবাস'। তখন আবার চলছে। এইটুকু শোনবার জন্যই যেন বারে বারে দাঁড়াচ্ছে তারা। যারা গন্ধক কাটছে, তারাও থামছে। তাদেরও পিঠ ঠুকে বলতে হচ্ছে 'সাবাস সাবাস'।

বিরক্তস্বরে নাথ বললেন : কী কুঁড়ের জাত বলুন তো ! শুধু এই 'সাবাস সাবাস' বলবার জন্যই এতগুলো লোক রাখতে হয়েছে আমাদের ! সারাদিন ধরে এই 'সাবাস সাবাস' বলেই ছোঁড়ারা ঝিমিয়ে যাচ্ছে।

সত্যিই এমন আর কখন দেখিনি। বিস্ময়ে যেন হতবাক হয়ে গেলুম।

উপরে উঠে একখণ্ড গন্ধক সংগ্রহ করলেন নাথ। পরীক্ষা করে বললেন : কোয়ালিটি তো আজ ভালই বলে মনে হচ্ছে।

আশ্চর্য হয়ে বললুম : এসব পরীক্ষা করতেও শিখেছেন বুঝি ?

নাথ সগর্বে বললেন : মুখার্জি সাহেবের কল্যানে আপনার সব কাজই শিখেছি। এতদিন আমিই তো চালালাম আপনার কাজ !

বলে তাঁর জ্ঞানের পরিচয় আমাকে দিলেন, বললেন : এই যে সালফার ওর আমরা কাটছি এতদিন ধরে, এর পিউরিটি প্লাস পঞ্চাশ থেকে আশি পার্সেণ্ট পর্যন্ত পাওয়া গেছে।

আমি হাসলুম তাঁর কথা শুনে।

নাথ একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে বললেন : আপনি হাসছেন ?

আনন্দ পাচ্ছি আপনার কথা শুনে।

এবারে নাথও হাসলেন।

তুতিনজন কর্মী আমাদের দেখে ছুটে এসেছিল। নমস্কার করেই

ফেটে পড়ল : এদের দিয়ে মানুষে কাজ করাতে পারে না সার। হয় এদের তাড়ান, নয় আমাদের।

যে বলল তার পিঠ থাবড়ে নাথ বললেন : সাবাস সাবাস !

যেমন হঠাৎ ফেটে পড়েছিল, তেমনই হঠাৎ জল হয়ে গেল। বলল : আপনার কথার জন্যই শুধু পড়ে আছি সার, নইলে কবে পালিয়ে যেতাম।

উত্তাপটা জাগিয়ে রাখল আর একজন। বলল : এই দেখুন, একদণ্ড আপনাদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছি, গুটি গুটি কেটে পড়ছে লোকগুলো।

আর একজন নিচের কয়েকজন লোককে দেখিয়ে দিল। কাঠের আগুন জ্বেলে তারা বিরাট একখানা রুটি সেঁকছে। কর্মীটি উত্তেজিত-ভাবে বলল : কিছুতেই ওদের ধরে রাখতে পারলাম না। বুটের ঠোক্কর খেয়েও উঠল না ওরা। এমন হতভাগা !

এর কথা শুনে আমি আশ্চর্য হলুম। মানুষকে এরা বুটের ঠোক্কর মারছে ! আমার মুখের ভাব লক্ষ্য করে বলল : কী করব সার, এরা তো মানুষ নয়, জানোয়ার এরা। বুটের গুঁতো না খেলে নড়ে বসতেই চায় না।

বললুম : ভয় করে না, এইসব ষণ্ডা লোকগুলোকে ঠোক্কর মারতে ?

হেসে উত্তর করল কর্মীটি : প্রথমটায় করত বৈকি ! পরে দেখলাম আমাদের ভয়েই এরা সারাক্ষণ মরে আছে। হাতীর মতো শরীর আছে, বুদ্ধি নেই মাথায়।

উপর থেকে আমরা নামলুম ঐ লোকগুলোর ধার ঘেঁষে। তাদের একটা দল তখন রুটি সেঁকা শেষ করে গোল হয়ে খেতে বসেছে। সকলের হাতেই এক-একটা কাঁচা পেঁয়াজ, মাঝখানে একখানা বিরাট পুরু আটার রুটি। দশ বারোটা লোক একসঙ্গে সেই রুটিখানা ছিঁড়ে খাচ্ছে কাঁচা পেঁয়াজের সঙ্গে।

পাশ দিয়ে আমাদের যেতে দেখে কেমন একটু জড়োসড়ো হয়ে বসল। একজন কর্মী বলল : আর কিছুদিন পরে এরা জলে গুলে আটা খাবে ছাতুর মতন। রুটি সেঁকবার পরিশ্রমটুকুও তাহলে বাদ দিতে পারবে।

রতন দাসের সঙ্গে দেখা হল একটু রাতে। সূর্য কখন অস্ত গেছে টের পাইনি। অন্ধকার হয়েছিল সাড়ে সাতটার পর প্রায় আটটার সময়। মিষ্টার নাথ তাঁর নিজের ঘরে এখন প্রায় বেহুঁস। মদের মাত্রাটা নাকি তাঁর প্রায়ই একটু বেশি হয়ে যায়। আমি একখানা ক্যাম্প চেয়ারে শরীরটা এলিয়ে দিয়ে নানান কথা ভাবছি। বাহির থেকে দরজায় টোকা দিল দাস, আস্তে আস্তে বলল : সার কি ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি ?

উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিলুম। অতি সন্তর্পণে দাস ঘরে ঢুকেই দরজাটা ভেজিয়ে দিল। বাহিরে কনকনে হিমেল হাওয়া বইছে সন্ধ্যেবেলা থেকেই। কোনরকমে আহার সেরে কম্বলের ভিতরে যে আশ্রয় নিয়েছে সবাই, তাতে আমার সন্দেহ নেই। আমিও শুয়ে পড়তুম ; কী ভেবে শুইনি, তাই হয়তো ভাবছিলুম খানিকক্ষণ থেকে। দাসকে একটা চেয়ার দেখিয়ে বললুম : বসো।

দাস বসবার জন্যই এসেছিল, সঙ্কোচ না করে বসে পড়ল। বলল : বাঙলাতেই কথা বলি, কী বলেন সার ! এখানে তো বাইরের লোক নেই !

বললুম : তাতে আর আপত্তি কি !

দাস বলল : আপনার আপত্তি নেই, কিন্তু পাঁচজনে এটা ভালো মনে করেনা।

একটু থেমে বলল : আমি জানতাম, আপনি এত তাড়াতাড়ি ঘুমতে অভ্যস্ত নন।

আশ্চর্য হয়ে বললুম : আমাকে চেন নাকি তুমি ?

দাস অপ্রতিভ হল না, বলল : আপনাকে না চিনলে কী হবে, বাঙালীর অভ্যাসের কথা তো জানি।

আশ্বস্ত হয়ে বললুম : তা বটে।

দাস বলল : আপনার কাছে দুদণ্ড বসবার জন্যে সারাদিন মনটা অস্থির হয়েছিল। কিন্তু কী করব! চারিদিক সামলাতে হয় একা আমাকেই। একদিকে নজর না দিলেই সেদিকে গোলমাল। সপ্তাহের আর পাঁচটা দিন তবু একটু ফুরসৎ থাকে, কিন্তু এই গাড়ির দুটো দিন মরবারও ছুটি নেই আমার। আপনিই বলুন সার, ঝামেলা কি কম?

বলে আমার দিকে তাকাল।

তার ঝামেলার কতটুকুই বা আমি জানি! তবু মাথা নেড়ে সায় দিতে হল।

দাস বলল : বর্ডারের স্টেশন বলেই ঝামেলা হয়েছে আরও বেশি।

কিসের বর্ডার?

দাস বলল : জানেন না বুঝি? তা জানবেনই বা কী করে? আপনি তো সবে আজই এলেন! বৃটিশ আর স্বাধীন বেলুচিস্থানের বর্ডার নোককুণ্ডি স্টেশন। সকালবেলা লক্ষ্য করেননি, ট্রেনটা এসে আর ছাড়তেই চাইছিল না! ঝাড়া চার থেকে পাঁচঘণ্টা কাষ্টম্‌সের চেকিং হবে। তারপর আমরা আমাদের জিনিস পাব। আর জিনিসও কি কম? ট্রেন ছাড়বার চার ঘণ্টা পরেও সব গুটিয়ে তোলা সম্ভব হয় না এক একদিন। দেরিতে এলে রক্ষে নেই। এমন লক্ষ্মীছাড়া লোক এদিকের, একটা না একটা জিনিষ বেহাত হয়ে যাবেই।

কী আসে এত সব জিনিস?

প্রবল উৎসাহে দাস বলল : সবই তো আসে সার, আমাদের খাবার জিনিষ—শাকসব্জি ডিম থেকে বিড়ি সিগারেট এমনকি নাথ সাহেবের মদ পর্যন্ত।

গলা একেবারে খাদে নামিয়ে বলল শেষ কথা কটি।

বড় রিস্কি কাজ সার : দাস বলে চলল : এই মদ যোগাতে না পারলে আমার চাকরি যাবে। তাই লুকিয়ে চুরিয়ে ট্রেনের গার্ডের হাত দিয়ে এইসব জোগাড় করি।

রিস্কি কিসের হে ! যুদ্ধের বাজারে মদ তো খুব জোরে চলেছে আজকাল।

রিস্কি নয় সার ? এই আগ্নেয়গিরির ওপর মদ এলে কি রক্ষে আছে, খুনোখুনি শুদ্ধ হয়ে যাবে যে ! আমাকেই খুন করবে সকলের আগে।

আশ্চর্য হয়ে বললুম : সেকি !

উত্তর দেবার জন্য দাস তৈরি ছিল, বলল : ছ্যাঁচড়ামি করে এই পয়সা জোগাড় করি স্যার, নাথ সাহেব তো দাম দেন না। দেশের লোক বলেই আপনাকে বললাম, বলবেন না যেন ওঁকে। আর লুকিয়েই বা কী করব ? দুদিন পরে তো সবই জানতে পারবেন। নালিশে নালিশে সবাই আপনার কান ঝালাপালা করে দেবে। তখন ভাববেন, দাসের চেয়ে খারাপ লোক বোধ হয় দুনিয়ায় হয় না।

আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলুম। দাস বলল : এখানে জলের কাজ করে কি আর পপুলার হওয়া যায় সার ! গভর্মেন্ট দিয়েছে কোটা বেঁধে। কুলিদের মাথা পিছু এক গ্যালন, আমাদের মাইনের ওপর চার থেকে ছ গ্যালন, আপনাদের দশ। এতেই সারাদিনের সব কাজ করতে হবে। রান্না থেকে স্নান পর্যন্ত। আপনিই বলুন সার, জল তো আমি তৈরি করি না। একজনকে বেশি দিলে আর একজন কম পাবে। তার জবাব তো আমাকেই দিতে হবে। দুর্ঘটনার কথা তো ভাবেই না কেউ। একদিন যদি ট্যাঙ্কটাই না আসে, কিংবা ফুটোফাটা হয়ে বেরিয়ে যায় আদ্ধেক জল, কিংবা, ভগবান না করুন, ট্রেনখানাই উল্টে যায় বালির ওপর, তাহলে আমাদের কী হবে এখানে ? কুলি ব্যাটারা তো পেঁয়াজ খেয়ে বেঁচে থাকবে, আমাদের দুর্দশার কথা ভেবে দেখুন। লেখাপড়া শিখে

আমাদের কর্মীরা যদি এটুকু না বুঝল, তো কী শিক্ষা পেয়েছে বলুনতো। গলা ফাটিয়ে শুধু চীৎকার করবে, পয়সা নিয়ে দাস জল বিলোচ্ছে স্টেশনে, আর—

উত্তেজিত দাস হঠাৎ সামলে নিল নিজেকে, বলল: কী বর্বর বলুন। এই দুর্দান্ত শীতে শেষরাতে উঠতে কষ্ট হয় বলে মাঝে মাঝে আমি রাতে গিয়ে স্টেশনে পড়ে থাকি, তারও একটা কদর্থ করেছে। সকলে ভাবে, স্টেশনের চাকরি হল বৈকুণ্ঠের চাকরি, রাতদিন নাথ সাহেবের কাছে লাগাচ্ছে আমার চাকরি খাবার জন্যে। আমিও বলে রাখছি সার, এই শীতে যদি কেউ স্টেশন ক্লার্কের কাজ করতে পারে তো আমার নাম বদলে ফেলব আমি। গ্রীষ্মটা হয়তো কেঁদে ককিয়ে চালিয়ে নেবে। তখন সকাল হয় সাড়ে ছটায় আর সন্ধ্যে দশটার পর। একশো ষোল থেকে আঠারো ডিগ্রী অবধি গরম ওঠে সত্যি, রাতগুলো ভারি ঠাণ্ডা। সত্তর ডিগ্রীর নিচেও নামে এক একদিন। তখন তাঁবুর বাইরে পাথরের ওপর বালিশ বিছিয়ে আমরা রাত কাটাই।

দাসের চোখে সেই রমণীয় রাতের স্বপ্ন জড়িয়ে আছে দেখলুম।

এক মিনিট নিঃশ্বাস নিয়ে বলল: এখানে আপনার কোন কষ্ট হবে না সার। আপনার প্রয়োজনটুকু শুধু আমাকে জানিয়ে দেবেন। আমি আপনার দেশের লোক, আমার কাছে রেখে ঢেকে সঙ্কোচ করে কিছু বলবেন না। ভাববেন, আমি আপনার—

আশ্বাস দিয়ে বললুম: নিজের লোকই ভাবব।

অনেকক্ষণ থেকেই বাহিরে একটা সোরগোল শুনছিলুম। তা কান্নার শব্দ না উল্লাসের, তা বোঝবার মতো অভিজ্ঞতা তখনও হয়নি। দাসকে এই কথা জিজ্ঞাসা করলুম। তাচ্ছিল্য ভরে দাস জবাব দিল: কুলিরা গান গাইছে।

বললাম: তাঁবুর ভেতর থেকে গান গাইছে লোকগুলো?

দাস বলল: তাঁবুর ভেতর কেন হবে স্যার, বাইরে আগুন জ্বেলে বুনোদের মতো নাচগান করছে।

আমার এই বন্য আনন্দ দেখবার সাধ জাগল মনে। বললুম ঃ চল না একবারটি দেখে আসি।

দাসের দৃষ্টিতে বিহ্বলতা দেখলুম। এই দুরন্ত শীতের রাতে তুষারপাতের আশঙ্কায় যখন অস্থির হয়ে আছে মানুষের অন্তরাত্মা, তখন ঘরের উত্তাপ ফেলে বাহিরে যেতে চায় যে লোক, সে কি সুস্থ? নিঃশব্দে থেকে এই প্রশ্নই যেন বিস্তার করে দিল আমাদের বাচাল দাস। বাধা দিল না, আপত্তি করতে যেন শেখেনি লোকটা। আমার পিছনে দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল। আর শব্দ না করে খোলা দরজাটা ভেজিয়ে দিল ভাল করে।

সাঁ সাঁ করে হাওয়া বইছে এধার থেকে ওধারে। দড়িদড়া সুদ্ধ তাঁবুগুলো কেঁপে কেঁপে উঠছে। কথা না বলে আমরা এগিয়ে গেলুম। হঠাৎ যেন কথা বলতেই দাস ভুলে গেল।

খানিকটা দূরে অনেক কাঠ-কুটো জড়ো করে একটা আগুন জ্বালিয়েছে লোকগুলো, বাতাসের তাড়নায় লকলক করছে তার ক্ষুধার্ত শিখা। এই আগুন ঘিরে বসেছে তিরিশচল্লিশটা লোক। জনকয়েকের হাতে একরকম অদ্ভুত তারের যন্ত্র, ক্যাঁচ কোঁচ করে নির্দয় ভাবে ছড চালাচ্ছে তার উপর। মাঝখানে ওড়না মাথায় একজন মেয়ে নাচছে কোমর দুলিয়ে, তারই সঙ্গে গান।

দাসের দুপাটি দাঁত কড়মড় করছিল অনেকক্ষণ থেকে। কথাটা এবারে বলেই ফেলল ঃ কী পাশবিক অপচয় বলুন! কত কষ্ট করে রেলের গাড়ি ভরে এই কাঠ আনাচ্ছি আমরা, আর ব্যাটারা ফুর্তি করবার জন্যে এই কাঠ পোড়াচ্ছে! না দিলে আমার মাথাটা পোড়াবে, নিতান্ত সেই ভয়েই বার করে দিই।

চিরকালের বেহিসেবী মন আমার, দাসের হিসেবে তাই উৎসাহ পেলুম না। বললুম ঃ এরা রোজই এমনি গায়?

বিরক্তস্বরে দাস বলল ঃ রোজ বলে রোজ, একটা রাতও শান্তিতে ঘুমতে দেয় না। আর এই কাঠ না জোগালেই লাঠালাঠি মারামারি!

মেয়েটি মিষ্টি করে গাইছিল: এক মরতুম বিয়া।

সমস্বরে তার কী জবাব দিল পুরুষরা, তা বোঝা গেল না। দাসকে আমি এর মানে জিজ্ঞাসা করলুম।

দাস বলল: ঐ মেয়েটা বলছে, 'আমায় একটা লোক ডেকে দাও'। তার উত্তরে ওরা সবাই বলছে, 'এই তো, আমরা সবাই আছি তোমার জন্যে।'

খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখে বললুম: আমাদেব ক াম্পে মেয়েও আছে বুঝি?

হা-হা করে হেসে উঠল দাস। বলল: মেয়ে কোথায় দেখলেন সার? ওতো আমাদের মীব বক্স, রান্নার জোগান দেয় ঐ ছোকরা।

একসময় ধীরে ধীরে আমরা ঘরে ফিরে এলুম। দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে দাস বলল: আজ প্রথম দিন বলে আপনার হয়তো ভাল লাগল। ছুদিন পরে আপনিও সকলের মতো হাঁপিয়ে উঠবেন ওদের কাণ্ডকাবখানা দেখে।

অনেক রাত অবধি আমাব ঘুম এল না। মনে হল, এই মরা আগ্নেয়গিরিটার মতো মানুষগুলোও হয়তো মরে গেছে। যেটুকু প্রাণের স্পন্দন আজ দেখলুম, তা গন্ধকের পাথরে স্ফুলিঙ্গের মতো মুহূর্তের চকমকি। শেব পর্যন্ত খুঁড়ে গেলেও আজ আর লাভা বেরবে না।

তিন

পাঞ্জাবের মানুষগুলো ঠিক বেলুচদের মতো নয়। সীমান্তের মানুষদের সঙ্গেও তাদের প্রভেদ আছে অনেক। কিন্তু এক জায়গায় এদের সবার মিল ছিল। এদের একজনকে আর দশজনের

ভিতর চিনে বার করতে আমার কষ্ট হত। সেই গৌর দীর্ঘাঙ্গ পুরুষগুলির হাবেভাবে আচারে-আচরণে কথায় ও ভঙ্গিতে আমি কোন প্রভেদ খুঁজে পেতুম না। রাওলপিণ্ডিতে এক গহর খান আমার পরিচর্যা করেছিল। আমি দেখলুম, সেই গহর খান যেন সহস্র রূপ ধরে রাওলপিণ্ডির পথে-ঘাটে বাজারে-হাটে সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে।

শৈশবে আমার ঠিক এমনি ভুল হত দার্জিলিঙে। সেখানে কাঞ্চনজঙ্ঘার রূপ আমাকে যত না মুগ্ধ করত, তার চেয়ে বেশি বিস্মিত করত রঙ-বেরঙের সাহেব-মেম। হঠাৎ মুখোমুখি হয়ে যখন 'হ্যালো জিমি' 'হ্যালো জ্যাক' বলে ঝুঁকে করমর্দন করেছে দুজন সাহেব, আর পাশে দাঁড়িয়ে থিও হেসেছে ক্ল্যারার পানে চেয়ে, আমি আশ্চর্য হতুম তাদের মানুষ চেনবার ক্ষমতা দেখে। জিম কী করে জ্যাককে চেনে, আর থিও ক্ল্যারাকে! অনেক ভেবেও এর হদিস আমি পাই নি। দার্জিলিঙের চলমান জনতায় আমি সব সাহেবকে জিম ভাবতুম আর সব মেমকে থিও। যেমন তাদের সব আলসেসিয়ানকেই ভাবতুম একটা কুকুর।

অনেক দিন পরে আমার এই সব কথা মনে পড়ল আলিপুরের এক উকিল-বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে। এক জায়গায় কয়েকজন গহর খানকে ভিড় করতে দেখলুম। আর এক গহর খানকে দেখলুম আসামীর গাঠগড়ায়। এই লোকটা নাকি খুনের আসামী! কিন্তু কী নিরুদ্বেগ নির্বিকার চেহারা তার! নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকে সমস্ত এজলাসকে যেন উপহাস করছে। আশ্চর্য মানুষ! বাহিরের গহর খানরাও তার ভাব দেখে আশ্চর্য হচ্ছে।

আমার বন্ধু বিপক্ষের উকিল। সেও এই রহিম খানকে দেখে নাকি আশ্চর্য হচ্ছে। বলল: নিজের পক্ষ সমর্থনে লোকটা উকিল দেয় নি। তার স্বজাতির জনকয়েক বিনি পয়সায় উকিল ধরবার চেষ্টায় আছে, কিংবা কম পয়সায়। বুকের ছাতি দেখিয়ে আর হাতের

লাঠি ঠুকে যারা মামলার নিষ্পত্তি করে, সরকারী আদালতে তাদের ভয়ের অন্ত নেই। এই সব কালোকোট-পরা বাঙালী বাবুরা নাকি সাংঘাতিক! একবার পাল্লায় পড়লে যে বুকের-রক্ত-জল-করা টাকা জলের মতো বেরিয়ে যাবে, তাতে সন্দেহ নেই। তবু তাদের ভিতর খানিকটা চাঞ্চল্য আছে। কিন্তু আসামী নিজে স্থির পাথরের মূর্তির মতো। তার মুখের ভাব দেখে মনে হচ্ছে যে, ওই লোকগুলোর দুশ্চিন্তা দেখে মনে মনে নিশ্চয়ই সে হাসছে।

আশ্চর্যের এইখানেই শেষ নয়। অল্পক্ষণ পরেই আবিষ্কার করলুম যে বিস্ময়ের শুরু এইখানে। তাকে জেরা করতে গিয়ে আমার উকিল-বন্ধু থমকে থেমে গেলেন। লক্ষ্য করলুম, ভয়ে লোকটার মুখ পাণ্ডুর হয়ে গেছে। হাত দুখানা ছিল কাঠগড়ার রেলিঙের উপর, সে দুখানা থরথর করে কাঁপছে। আমি তার দৃষ্টিকে লক্ষ্য করে দেখলুম, দরজার উপর আর এক গহর খান হিংস্র দৃষ্টি মেলে দাঁড়িয়ে আছে। শুধু একটা চোখের দৃষ্টি, আর একটা চোখ কানা। মুখের চামড়ায় বার্ধক্যের ছাপ বড় তীব্র। এত বয়সেও হিংস্রতা একটুও কমে নি।

এই দৃষ্টি আমার চেনা মনে হল। মনে হল, অনেক দিন আগে হয়তো বা কয়েকটা যুগ আগে এই দৃষ্টি আমি দেখেছি। আর তারই সামনে আর একটা লোকের এমনি ভয়, এমনি কাতরতা। এরা কি আমার চেনা মানুষ!

বন্ধুর সঙ্গে কাজ মিটতে সময় লাগল না। কিন্তু রহিম খানের স্মৃতি মুছল না মন থেকে। সন্ধ্যেবেলায় বাড়ির বারান্দায় বসে আমি এই কথাই ভাবছিলুম, ভাবছিলুম আসামী রহিম খানের কথা। যে লোকটা ফাঁসিকাঠে ঝুলবে জেনেও ভয় পায়নি এতটুকু, সে একটা মানুষকে দেখে অত বিচলিত হল!

দক্ষিণ থেকে বাতাস বইছে অল্প অল্প। সেই বাতাসে মোটা চুরটের ধোঁয়া কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। আমার ভাবনা

অন্বেষণে বেরল, অস্পষ্ট অতীত হাতড়ে হারানো গহর খানকে আবার উদ্ধার করবে।

সে আমার প্রথম যৌবনের গল্প। গন্ধকের পাহাড়ে বেলুচদের সঙ্গ আমার অসহ্য মনে হয়েছিল। বদলি নিয়ে রাওলপিণ্ডির ছাউনিতে এলুম। সেখানে পরিচয় হল নবীন অধ্যাপক সাহনির সঙ্গে। ভারত কোনদিন বিভক্ত হবে, সে কথা সেদিন কল্পনাও কেউ করে নি। আমরাও করিনি। সাহনি তবু বলল: এতদূর এসেছ, এ ধারটা দেখে যাও। আবার কবে আসবে তার তো ঠিক নেই।

কিন্তু সময় কই?

সাহনি বলল: খাইবার পেশাবার যদি নাও দেখ, ট্যাক্সিলা না দেখে গেলে দুঃখ থেকে যাবে। এখান থেকে ঢিল ছুঁড়লে সেখানকার জাদুঘরের ছাদে পড়ে।

তক্ষশীলা! রাওলপিণ্ডি থেকে মাত্র কুড়ি মাইলের পথ। ট্রেনে চাপলে চল্লিশ মিনিট সময় লাগে পৌঁছতে। সাহনির বোধ হয় নিজেরও কোন কাজ ছিল সেখানে। তাই আমাকে উৎসাহ দেবার জন্য তক্ষশীলার পুরাতত্ত্ব শোনাল। বলল: ট্যাক্সিলা কি আজকের দেশ! রামচন্দ্রের ভাই ভরতের বড় ছেলে তক্ষ এই রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ভরতের মামা যুধাজিৎ তখন কেকয়ের রাজা। গান্ধারদেশ আপন রাজ্যভুক্ত করার জন্যে রামচন্দ্রকে তিনি আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। ভরত এই রাজ্য জয় করে নিজের দুই পুত্রের মধ্যে ভাগ করে দেন।

সাহনি থামল একটুখানি। তারপর হাসল। বলল: বিশ্বাস হল না এ সব কথা, এই তো?

আমি কোন জবাব দেবার আগে নিজেই বলল: তোমার বিশ্বাস হবে এমন গল্পও আছে আমার কাছে।

সাহনি ইতিহাসের অধ্যাপক। ইতিহাস ভালবাসে, ভালবাসে পুরাতত্ত্বের গল্প শোনাতে। আমার সম্মতির অপেক্ষা না রেখেই

বলল : আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের সময় তক্ষশীলার রাজা তাঁকে সাহায্য করেন। কিন্তু পরে তাঁর সেনাপতি সেলুকস এই রাজ্য জয় করে মগধরাজ চন্দ্রগুপ্তকে উপহার দেন। তক্ষশীলায় প্রজা-বিদ্রোহ হয় প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে বিন্দুসারের সময়। জ্যেষ্ঠ পুত্র সুসীমার অক্ষমতা দেখে বিন্দুসার তাঁর মেজো ছেলে অশোককে এই প্রদেশের শাসনভার অর্পণ করেন। অশোকের সিংহাসনপ্রাপ্তির পর তাঁর পুত্র কুণাল হলেন তক্ষশীলার শাসনকর্তা।

তারপর সাহনি একটা ঢোক গিললেন, বললেন : মৌর্যদের পর ব্যাকটি্রয়ার রাজা ইউক্রেটাইড্‌স্‌ দখল করলেন এই প্রদেশ। স্ট্রাবোর কথা হয়তো আমরা বিশ্বাস করতুম না, কিন্তু তার আর উপায় নেই। এ দেশের মাটি খুঁড়ে এখনও তাঁর প্রচলিত মুদ্রা পাওয়া যাচ্ছে। গ্রীকদের হাত থেকে তক্ষশীলা উদ্ধার করে শকেরা। সূর্য বা আবাসের্র পর কুশাণবংশীয় কনিষ্ক হলেন রাজা। তখন থেকে বৌদ্ধপ্রভাব।

আমার আর্তনাদ করতে ইচ্ছা হল। হাতজোড় করে বললুম : দোহাই তোমার সাহনি, তোমার তথ্যকথা থেকে রেহাই দাও। তক্ষশীলা যে দ্রষ্টব্য স্থান, বিনা তর্কে আমি মেনে নিচ্ছি। রাজীও হচ্ছি তোমার সঙ্গে যেতে।

সাহনি হেসে ফেলেছিল, বলল : ধন্যবাদ।

গাড়িতে উঠে ভেবেছিলুম, কী দেখবার আছে জিজ্ঞাসা করব। কিন্তু সাহস হল না। আবার কোন তত্ত্বের আলোচনা উঠে পড়লে মারা পড়ব। কিন্তু খানিকটা চুপচাপ কাটাবার পরেই সাহনি জিজ্ঞাসা করল : মহেঞ্জোদারোর গল্প শুনবে ?

আমি হাত জোড় করে বললুম : রক্ষে কর।

তক্ষশীলার কথা ?

উত্তর দেবার প্রয়োজন হল না। তার মুখের দিকে চেয়েই বুঝতে পারলুম যে সে আমার সঙ্গে কৌতুক করছে।

রাওলপিণ্ডি ও ট্যাক্সিলার মাঝে মাত্র তুটি স্টেশন। আমরা একখানা প্যাসেঞ্জার ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীতে যাচ্ছিলুম। শেষের স্টেশন থেকে এক ছোকরা গহর খান উঠল। বয়স শুধু অল্প নয়, মুখে একটু কোমল ভাব। গাড়ির আরও কয়েকজন গহর খানের সঙ্গে বেশ একটু প্রভেদ দেখলুম।

সাহনি বলল, কী দেখছ?

ওই ছোকরাকে।

সন্তর্পণে বেঞ্চিতে বসে লোকটি বাহিরে তাকাল। দৃষ্টিতে যেন একটু অন্যমনস্কতা, একটু ভাবালুতা। বললুম: এও পাঠান নাকি?

সাহনি হেসে বলল: সীমান্তের পাঠান আর পাঞ্জাবী ছাড়াও এ দেশে আরও একটি জাত আছে। তাদের আমরা পুঠুয়ারি বলি। পুঠ মানে বোঝ?

আমি যে জানি না সে জানে। তাই উত্তরটাও দিল নিজে। বলল: পাহাড়। দেখতেই তো পাচ্ছ কেমন পাহাড়ী দেশ, সেজন্যেই আমরা এদের পুঠুয়ারি বলি।

সত্যিই দেশটা উঁচু-নিচু পাহাড়ে ঘেরা। মাটির পোড়া রঙ। শীতে যেমন শীত, গ্রীষ্মে গরমও তেমনই। দিন ও রাতেও অনেক তাপের পার্থক্য। মাঝে মাঝে রাস্তার ধারে যে সব গাছ দেখতে পাচ্ছি। সাহনি তার নাম বলল কীকর আর টালি। কীকরগাছের আসবাব নাকি ভাল হয়। চীরগাছও দেখছি মাঝে মাঝে। এই চীরের বন দেখেছি হিমালয়ে।

হঠাৎ যেন গানের শব্দ পেলুম। ফিরে দেখি, সেই পুঠুয়ারি ছোকরা গুন গুন করে গান গাইছে। কান পেতে কথাগুলি শুনলুম।

চড়া লেও কুড়িয়ে ওয়াঙ্গা,
গোল গোল ওয়াঙ্গা।
গোল গোল ভিড়িয়াঁতে,
গোল গোল গোল ওয়াঙ্গা।

গানের কথার দিকে যে আমার মন গেছে, সাহনি তা বুঝতে পেরেছিল। বলল : মানে বুঝতে পারছ ?

বললুম : কী করে বুঝব ?

সাহনি হেসে বলল : ওয়াঙ্গা মানে চুড়ি, আর ভিড়িয়াঁ মানে হাতের কব্জি। এবারে চেষ্টা কর তো মানে বোঝাবার।

আমি কিছু বোঝবার আগেই বলল : গোল গোল হাতের কব্জিতে গোল গোল চুড়ি। চড়া লেও মানে, পরে নাও। চুড়িওয়ালা বলছে।

তক্ষশীলায় আর একবার এই গান শুনেছিলুম এই লোকটিরই মুখে। একটা কুয়ো থেকে খানিকটা দূরে একখণ্ড পাথরের উপর বসে আপন মনে গান গাইছিল। সাহনি আমার ভুল ধরিয়ে দিল, বলল : আপন মনে নয়। ওই দেখ।

চেয়ে দেখলুম, কুয়ো থেকে জল তুলছে একটা মেয়ে। সাহনির সঙ্গে আমিও যোগ করে দিলুম আমার নির্মল হাসি।

সাহনি বলল : এ দেশের কোন গল্প শুনবে ? হীর-রাঞ্জা কিংবা শশি-পুন্নুর গল্প—তোমাদের লায়লা-মজনুর মতো ?

অমন করে ভয় দেখিও না সাহনি। প্রেমের গল্পে আমি সত্যিই ভয় পাই।

সাহনি বলল : তবে পাঞ্জা সাহেবের গল্প শোন।

বললুম : সে আবার কী ?

পাঞ্জা সাহেবের নাম শোন নি ? সাহনি আশ্চর্য হল, বলল : অমৃতসরের গ্রন্থ সাহেবের নাম শুনেছ নিশ্চয়ই ?

বললুম : শুনেছি কেন, দেখেওছি।

সাহনি বলল : এখানে তেমনি পাঞ্জা সাহেবের গুরুদ্বার। ট্যাক্সিলা থেকে মাইল দশেক দূরে। বাসে যাও, ট্রেনেও যেতে পার। বৈশাখে বিরাট মেলা বসে। লক্ষ লক্ষ শিখ আসে সেদিন।

অকপটে স্বীকার করলুম যে পাঞ্জা সাহেবের নাম আমি শুনি নি।

সাহনি উৎসাহ পেল, বলল : তুমি কিছুই শুনতে চাও না, নইলে কত জিনিসই তোমাকে শোনাতে পারি।

বলেই পাঞ্জা সাহেবের গল্প শোনাল আমাকে। গল্প শুনতে শুনতেই আমরা তক্ষশীলার স্টেশনে পৌঁছে গেলুম। ছোট স্টেশন, তবু উপেক্ষা করবার নয়। কেন না জংশন স্টেশন। যেতে আসতে সমস্ত ট্রেন দাঁড়ায়, সেইটেই তার সবচেয়ে বড় পরিচয়।

সাহনির প্রয়োজন ছিল মিস্টার ঘোষের সঙ্গে। প্রথমেই আমরা তাঁর কাছে গেলুম। প্রবাসী বাঙালী মিস্টার ঘোষ সজ্জন, সেখানকার মিউজিয়মে কাজ করেন। পরিচয় হলে আমি আশ্চর্য হলুম এই ভেবে যে, এত দূরেও বাঙালী এসেছেন জীবিকার জন্য! মিস্টার ঘোষ বোধ হয় আমার মনের কথা ধরতে পেরেছিলেন। বললেন : বাঙালী দেখে আশ্চর্য হচ্ছেন তো! কিন্তু আমি এখানে প্রথম নই। যতদূর জানা গেছে, তক্ষশীলায় প্রথম বাঙালী ছিলেন জাতক-বিখ্যাত জীবক। জীবকের গল্প পড়েন নি মহাবগগ জাতকে?

নিজের অজ্ঞানতা স্বীকার করায় মিস্টার ঘোষ বললেন : তক্ষশীলার বিশ্ববিদ্যালয়ে অজ্ঞাতকুলশীল জীবক সাত বৎসর চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

পুরাকালে তক্ষশীলায় বিশ্ববিদ্যালয় ছিল জানি। খ্রীষ্টজন্মের সাত-আট শো বছর পূর্বে তার খ্যাতি ও প্রতিপত্তিব কথাও শুনেছি। সেদিন প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্র ছিল তক্ষশীলা। শুরু হয়েছিল প্রাচ্য আদর্শে। ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সবাই সমান কষ্ট স্বীকার করে গুরুগৃহে শিক্ষালাভ করবে। রাজার ছেলের সঙ্গে পাশাপাশি বসবে তার প্রজার ছেলে। কিন্তু তক্ষশীলার এই আদর্শ নষ্ট হল প্রতীচ্যের সংস্পর্শে এসে। কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তের পুত্র বিনা পরিশ্রমে শিক্ষালাভ করেছিলেন এক সহস্র মুদ্রার বিনিময়ে। তিলমুখি জাতকে সেই গল্প আছে। এত কথা আমার জানা ছিল না। বলছিলেন মিস্টার ঘোষ। হঠাৎ বোধ হয় বুঝতে পারলেন যে এ গল্প

আমার ভাল লাগছে না। সামলে নিয়ে বললেন : জীবকের পরীক্ষার গল্পটা পড়ে দেখবেন, আপনার ভাল লাগবে।

তবু আমি সে গল্প শুনতে চাইলুম না।

ঘুরে ঘুরে মিস্টার ঘোষ তাঁর জাদুঘর দেখালেন, দেখালেন সেই সব দুর্লভ মুদ্রা ও তাম্রলিপি। বললেন : তক্ষশীলার পালি নাম তখশীলা। গ্রীকেরা বলল, টাক্সিলা। ফা হিয়েন বলেছিলেন চ-শা-শি-লো। তার মানে ছিন্ন মস্তক। বুদ্ধদেব এখানে তাঁর মাথা কেটে সহস্রবার ভিক্ষা করেছিলেন বলে লোকের বিশ্বাস। হিউ এন সাঙ বললেন তা-কা-শি-লো। এ জায়গার বিশদ বর্ণনা লিখলেন তাঁর ভ্রমণ-কাহিনীতে।

জাদুঘর দেখে বেরবার সময় মিস্টার ঘোষ আর একটা সংবাদ দিলেন। সেই সংবাদটি আমার ভাল লাগল। বললেন : তক্ষশীলায় আরও একটি দেখবার জিনিস আছে। সে ষাঁড়ের লড়াই। মধ্য-যুগের ষাঁড়ের লড়ায়ের গল্প পড়েছেন বিদেশী ক্লাসিকে, বিদেশী বায়স্কোপেও দেখেছেন কিছু কিছু। যদি হাতে সময় থাকে তো চক্ষু আজ সার্থক করে যান।

আমি বোধ হয় লাফিয়েই উঠেছিলুম। মিস্টার ঘোষ হেসে বললেন : একটু বসুন, সঙ্গে লোক দিয়ে দিচ্ছি। আটক নদীর পারে হয় ষাঁড়ের লড়াই। কিন্তু সাবধান, ওপর থেকেই দেখবেন, নিচে নামবেন না।

নদীর তীরে পৌঁছে উপরে কিছুই দেখতে পাচ্ছিলুম না। উৎসুক দৃষ্টি মেলে চারিদিকে চাইতে লাগলুম।

পাশে থেকে একজন লোক বলল : বুন।

আমাকেই যে বলল, তা বুঝতে পারলুম। কিন্তু অর্থবোধ হল না। সাহনি হেসে বলল : নিচে।

আরও খানিকটা এগিয়ে নদীর কিনারায় পৌঁছে আশ্চর্য হয়ে গেলুম। এ যেন মস্ত একখানি বাড়ির ছাদে উঠেছি। আটক নদী

বইছে অনেক নিচে দিয়ে। স্রোতের দু ধারে বিস্তীর্ণ বালুচর। ষাঁড়ের লড়াই হবে সেই বালির চরের উপর। একজন সুদর্শন ছোকরাকে দেখতে পাচ্ছিলুম। সাহনি বলল : সেই ছোকরা না ?

তাই কি !

আমি আরও মনোযোগ দিলুম।

সেই 'গোল গোল ওয়াঙ্গা,' তাই না ?

সাহনির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যেন আরও তীক্ষ্ণ হয়েছে।

আমাকে জিজ্ঞেস করছ ? তবেই বিপদে ফেললে। সবাইকে আমি যে একই রকম দেখি।

সাহনি এ কথার উত্তর দিল না। কিন্তু খানিকক্ষণ পরে নিশ্চিন্ত হয়ে বলল : সেই ছোকরাই।

কী করে বুঝলে ?

সাহনি বলল : দেখতে পাচ্ছ না, কেমন ভীরু হাবভাব। ও যে লড়াই করতে পারবে, বিশ্বাস হয় না।

আর একটা লোককে দেখতে পাচ্ছিলুম, লাঠি নিয়ে আস্ফালন করছে তার সামনে। বললুম : ও কী বলছে, বুঝতে পাচ্ছ ?

সাহনি বলল : বলবে আবার কী! শাসাচ্ছে তাকে। কিন্তু দেখতে পাচ্ছ তো, ছোকরা ভয়ে কেমন কাঁপছে ?

শেষ পর্যন্ত ষাঁড়ের মুখোমুখি দাঁড়াতে হল তাকে। বেশিক্ষণ নয়। প্রথম ধাক্কাতেই লোকটাকে শিঙের উপর তুলে নদীর জলের কাছে ফেলে এল।

মরে গেল, মরে গেল।

বলে চেঁচিয়ে উঠল কয়েকজন।

একজন বলল : মেরে ফেলল ছেলেটাকে।

আর একজন জানতে চাইল : নিজের ছেলে ?

উত্তরও পেয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে : নিজেরই তো।

সাহনি ও আমি মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলুম।

বাপ ছেলেকে দেখতে গেল না। লাফিয়ে গিয়ে ষাঁড়টাকে চেপে ধরল। তার পরেই মেতে উঠল লড়াইয়ে। আমি ছেলেটাকে লক্ষ্য করছিলুম ! জনকয়েক লোক তাকে চোখের আড়ালে বয়ে নিয়ে গেল।

তক্ষশীলা থেকে ফেরার পথে আমি কথা কইতে পাচ্ছিলুম না। বিষাদে সারা মন আমার আচ্ছন্ন হয়ে ছিল। মানুষ এত নৃশংস হতে পারে ! ছেলেকে এগিয়ে দেয় নিশ্চিত মৃত্যুর সামনে !

সাহনি জানতে চাইল : কী ভাবছ ?

আমি উত্তর দিলুম না। সাহনি ঠিকই সন্দেহ করেছিল, বলল : এরা বোধ হয় পুঠুয়ারি নয়। বড় শান্তিপ্রিয় জাত পুঠুয়ারি। বাণিজ্য ছাড়া আর কিছু তারা করতে চায় না।

তবে ?

সাহনি বলল : ছেলেটাকে পুঠুয়ারি বলেই সন্দেহ হয়, কিন্তু বাপের রক্তে সীমান্তের গন্ধ আছে।

একটু থেমে বলল : আজ এই অঞ্চলে তক্ক নামে যে জাতি আছে, টড সাহেব তাকে তুরস্ক জাতির শাখা বলেছেন। আমাদের পুরাণ এই জাতিকে তক্ষকের উত্তর-পুরুষ বলেছেন। তারা ছিল নাগোপাসক। তাই তাদের নিধনের জন্যে জনমেজয়ের সর্পসত্র-যজ্ঞ। মহাভারতে আছে তক্ষশীলায় মহারাজ জনমেজয়ের সর্পসত্র অনুষ্ঠানের গল্প। কানিংহাম সাহেব এদের অনার্য বলে আখ্যা দিয়ে গেছেন। রাজা কনিষ্কের সময় বৌদ্ধ প্রভাবে এদের নাগোপাসনা লুপ্ত হয়।

সাহনি বোধ হয় আরও কিছু বলত। কিন্তু আমার চোখের দিকে তাকিয়ে থেমে গেল। সাহনির বক্তৃতার দিকে আমার কান ছিল না। আমি ভাবছিলুম গহর খানদের কথা। বাপ ও ছেলের কথা। কী নৃশংস দৃষ্টি ! কী অমানুষিক আস্ফালন ! ছেলেটা কি মরে গেল ! কে জানে ! এ নিয়ে সাহনির কোন কৌতূহল নেই। মানুষের চেয়ে কি ইতিহাস বড় ? জীবন্ত মানুষের চেয়ে মৃতের কঙ্কাল ? আশ্চর্য মানুষ এই ঐতিহাসিক আর প্রত্নবিৎ !

সাহনি বলল ঃ কী ভাবছ ?

সংক্ষেপে বললুম ঃ তোমাদের কথা।

আজ অনেক দিন পর এই গল্প আমার মনে পড়ল। কিন্তু যাদের কথা ভাবতে গিয়ে মনে পড়ল তাদের কি আমি চিনতে পেরেছি। কেন জানি না, চিনতে পেরেছি বলেই মনে হল। তক্ষশীলার পিতাপুত্র যেন হারিয়ে যায় নি। তারাই এসেছে আজ আলিপুরের আদালতে। সেদিন আটক নদীর বালুতটে যে ভয় যে কাতরতা দেখেছি সেই ছোকরার দৃষ্টিতে, রহিম খানের দৃষ্টিতে আজ তাই যেন দেখতে পেলুম। মনে মনে স্থির করলুম, আমার উকিল বন্ধুর শরণ নেব।

আশ্চর্য ! আমার সন্দেহ সত্য বলেই প্রমাণ হল। রহিম খান পালিয়ে এসেছিল কলকাতায়। শুনেছিল, এখানকার লোক নাকি নৃশংস নয়। বাঙলা দেশের মানুষ মানুষকে ভালবাসে।

ভুল কথা। কিন্তু তর্ক করলুম না এ নিয়ে। বন্ধুর হাত ধরে বললুম ঃ এ মামলা তোমায় হারতে হবে ভাই।

বন্ধু আশ্চর্য হল ঃ সে কি! এ যে অত্যন্ত সহজ মামলা। পুলিসের সাক্ষীসাবুদ আছে, এ মামলা হেরে গেলে লোকে যে আমায় ছি-ছি করবে।

তা হোক।

বন্ধু বলল ঃ রহিম খানের বাপ আমার পায়ে ধরে পড়েছিল। ছেলেটাকে বাঁচাবার জন্যে তার সর্বস্ব দিতে চেয়েছে। শুধু ছেলেটাকে নিয়ে ভিক্ষে করে দেশে ফিরবে।

কী জবাব দিলে ?

বন্ধুর চোখও ছলছলে দেখলুম। বলল ঃ বুড়োটার হিংস্র দৃষ্টি জলে ভিজে ঘোলাটে দেখাচ্ছিল। কানা চোখটা কাঁপছিল থরথর করে। দু পা জড়িয়ে বলল, তুমি বিশ্বাস কর উকিলবাবু, ও আমার

ছেলে নয়, মেয়ে। অনেক চেষ্টা করেও ওকে ছেলে করতে পারি নি। মেয়ে কি খুন করতে পারে?

সেদিন তক্ষশীলায় এই লোকটাকে রহিম খানের বাপ বলে বিশ্বাস করি নি। আজ করলুম। বিশ্বাস করলুম যে বুড়োটা ঠিক কথাই বলেছে। রহিম খান আর যাই পারুক, মানুষ খুন করতে কিছুতেই পারবে না।

মামলায় আমার বন্ধু হেরে গেলেন। সে কি আমার কথায়, না বুড়োটার কান্নায়! হেরে গিয়েও তাকে হাসতে দেখলুম। আর আমার কানে বেজে উঠল সেই গান—

চড়া লো কুড়িয়ো ওয়াঙ্গা,
গোল গোল ওয়াঙ্গা।
গোল গোল ভিড়িয়াঁতে,
গোল গোল ওয়াঙ্গা।

চার

একদিন যুদ্ধ থামল। কাজের শেষ হল আমাদের। শুনলুম, সরকার আমাদের ভিন্ন চাকরিতে বহাল রাখবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু আমার হাতে তখন কিছু কাঁচা টাকা আর প্রচুর গরম কাপড়। হিমালয় আমাকে টানল। হিমালয় পেরিয়ে তিব্বত। নিষিদ্ধ দেশ। ভাবলুম, যতটা ছোঁয়া যায়, ততটাই ছুঁয়ে আসি।

তিব্বতে অভাব নেই বলে শুনেছিলুম। অভাব বোধও নেই। অমন শান্তির দেশে কি আমার কিছু হবে না! অনেক আশা নিয়েই হিমালয়ের পরপারে গিয়েছিলুম। কিন্তু ফিরে আসতে হল। সে কথা অন্যত্র বলব।

ফিরে এসেও বিপদ। ভ্রমণ কাহিনী কেন লিখলুম না, সেই কৈফিয়ৎ দিতে হয়েছে অনেকের কাছে। নূতন কোন দেশ দেখে এলেই লেখ ভ্রমণ কাহিনী, এই রেওয়াজই চলছে সব দেশে। তার উপর আমি দেখে এলুম এমন দেশ, যার নামেই গায়ে কাঁটা দেয়। কিছুদিন আগেও তো সেখানে যাবার অধিকার ছিল না। তবু লোকে বই লিখেছে তিব্বতে তিন বছর, তিব্বতে সাত বছর। তিব্বত অতীত ও বর্তমানের। আরও কত কি! অথচ আমি একটা প্রবন্ধও লিখলুম না। অপরাধটা গুরুতর বৈকি!

কেন লিখলুম না, সে কথাটা বলবার সাহস নেই, আমি তো ঠিক দেশ দেখতে যাইনি, গিয়েছিলুম মানুষগুলোকে চিনে তাদের সঙ্গে রয়ে যেতে। কেন ফিরে এলুম সে অন্য কথা, কিন্তু কিছু লিখতে গেলে মানুষগুলোর কথাই যে আগে মনে পড়ে যায়। তাদের সুখদুঃখ আশা নিরাশার কথা। তাদের অসহায় অজ্ঞানতার কথা। দুঃখ হয় সেই মানুষগুলোর জন্য। কান্নার মতো একরকম তীব্র বেদনা অসাড় করে আনে আমার মনের স্নায়ুগুলো। নিজেকে আমি হারিয়ে ফেলি।

এমন সরল ধর্মান্ধ মানুষ আমি নিজের দেশে কখনও দেখিনি। শুনেছি, আমাদেরও দেশের নাকি ধর্মান্ধতা আছে। কিন্তু ঠিক এমনটি কি? শিশু যেমন হাসতে হাসতে আগুনের শিখায় হাত বাড়িয়ে দেয়, তারপর পুড়ে গেলে কাঁদে, এখানকার মানুষও তেমনি। ধর্মের নামে আত্মসমর্পন করে অনায়াসে, তারপর সারাজীবন ধরে তার প্রায়শ্চিত্ত।

পেম্‌বা, দাওয়া, পাসাঙ—কার কথা বলব! সব মেয়েই তো একই রকমে পুড়ে মরে। আর এদের পুড়িয়ে মারতে লামারও অভাব নেই এদেশে। তালে লামা, পেনছেন লামার দেশ। যুগ যুগ ধরে ধর্মবিশ্বাস নিয়ে বেঁচে আছে যে দেশের মানুষ, সেই দেশেও জন্মায় আল্‌চু টুল্‌কু বা শাবড়ুং লামার মতো লোক, যারা পারে না সংসারে এমন কাজ নেই।

এই তো সেদিন নিজের চোখের সামনেই শাবড়ুং লামার কাণ্ড দেখলুম। তখন আমি লাসা থেকে শিগাসে হয়ে দেশে ফিরছি। শীত শেষ হয়ে বসন্ত পড়েছে। ক্যাকা পাখিগুলো জমির উপর নেমে প্রবল উত্তমে ঝগড়া শুরু করেছে। একটা ক্যাকা আর একটাকে হয়তো ঠুকরে ঠুকরে মেরেই ফেলবে। আর সবাই দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে আর কলরব করছে, ঝগড়া থামাতে এগিয়ে আসছে না কেউ। দূরের মাঠে কিয়াং ঘোড়াগুলো ঘুরপাক খেতে খেতে রাস্তার এপার থেকে ওপারে চলে যাচ্ছে। একটা ছুটো নয়, একদল বেয়াড়া বন্য ঘোড়া। ধরে পোষ মানাবার উপায় নেই। চেষ্টাও দেখিনি কারও। সবাই বলে, ও পোষ মানবার জীবই নয়। আমাদের দেশ হলে অত সহজে যে আমরা হার মানতুম না, তা জানি। অন্তত চেষ্টার ত্রুটি রাখা হত না।

সাংপো নদীর ধারে একদল যাত্রীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তারা খাম আর ডাম গিয়াশো থেকে খাং রিম্‌পোছের তীর্থ করতে যাচ্ছে। সো-মাফাঙে অবগাহন করে খাং রিম্‌পোছে তিনবার প্রদক্ষিণ করবে। কেউ কেউ এই প্রদক্ষিণ করবে দণ্ড খেটে। কৈলাস আমাদেরও তীর্থ। আমরাও মানস সরোবরে স্নান করে কৈলাসে উঠি।

এরা কিন্তু আমাদের মতো তীর্থ করে না। রথ দেখতে বেরিয়ে এরা কলাও বেচে। নিজেদের দেশে যা কিছু উদ্বৃত্ত হয় এদের, তা ইয়াকের পিঠে বেঁধে এরা বেরয়। সেই সব জিনিষ বিক্রি করে পুরাং, গ্যানিমা মণ্ডি বা গ্যাকার্কোর বাজারে। ফিরবে ভারতীয় জিনিষ নিয়ে। ভারতের টাকা, প্রবাল আর রেশমি কাপড় এদের বড় পছন্দ। মেয়েরা ভারতীয় টাকার মালা পরবে গলায়, চুলে পরবে প্রবাল আর কড়ির হার, রেশমি কাপড় পরবে বড়লোকের ছেলে মেয়ে।

বিরাট এক যাত্রীদল। কী জানি কী খেয়ালে আমিও এই দলে ভিড়ে গেলুম। ভাবলুম, সিকিমের ভিতর দিয়ে না গিয়ে কৈলাস আর মানস-সরোবর দেখে আলমোড়া হয়ে দেশে ফিরব। এতদিনই যখন এদেশে কাটালুম, তখন আর ছু-একটা মাসে কী এসে যাবে!

একে ঠিক খেয়াল বলব না। কৈলাস আমাকে টানলেন। গভীর রাতে স্বপ্ন দেখলুম। কৈলাসের স্বপ্ন। দেবাদিদেব মহাদেবের ধ্যানমগ্ন মৌন মূর্তি দেখলুম না। দেখলুম না তপস্যারতা পার্বতীকে। আমার চোখের সামনে এক উজ্জ্বল তুষার স্তূপ আমার দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে রইল। মনে হল আমি যেন এক মুকুরের উপর নিজের প্রতিবিম্ব দেখছি—ত্রিদশবনিত্যদর্পণস্যাতিথিঃ স্যাঃ। দুপাশের অন্ধকারাচ্ছন্ন পর্বতশ্রেণীর মতো নিজেকে অজ্ঞান অসহায় বোধ করলুম। এক রকম অদ্ভুত অস্থিরতা নিয়ে আমার নিদ্রাভঙ্গ হল। তাঁবু ছেড়ে মুক্ত আকাশের নিচে এসে দাঁড়ালুম।

রাত তখন শেষ প্রহর। একটা একটা করে লোক তাঁবুর বাহিরে বেরিয়ে আসছে। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। তাঁবুর ভিতর একটা বিড়ি কিংবা চুরট ধরিয়ে বার হচ্ছে তারা। বাহিরের দুরন্ত হাওয়ায় সে কাজ অসাধ্য হবে।

দূরে খটখট আওয়াজ করে একদল যাত্রী তাঁবু তুলছিল। তাদেরই একটা লোক ককিয়ে ককিয়ে গাইছে : ইয়া ইয়া গ্যু গ্যু জের।

শেষ রাতের শীতল হাওয়া তীরের ফলার মতো বিঁধছে। নিচে থেকে পায়ের লাম্‌খো জুতো উঠেছে হাঁটু অবধি। আর গায়ের ছুব্বাও নেমেছে হাঁটুতে। জট পাকানো চুলের উপর উলের টুপি। তবু বুকের হাড় কখানা ঠক্ ঠক্ করে কেঁপে ওঠে। আর সেই লোকটা গায় : ইয়া ইয়া গ্যু-গ্যু জের।

আমি আশ্রয় পেয়েছিলুম পেম্‌বাদের তাঁবুতে। পেম্‌বার স্বামী নেরেভু খামের একজন সমৃদ্ধ গৃহস্থ।

খাম! ঐ নামেই গায়ের রক্ত হিম হয়ে যায়। খামের লোকের নামে ভয় পায় না, এমন লোক গোটা তিব্বতে নেই। ওরা ঠিক মানুষ নয়। মানুষ শুধু চেহারাতে। তা না হলে হাসতে হাসতে মানুষ মারতে পারে! একটা চেঙকু মারতে আর দশজনের যে মায়া, তার কিছুও কি এদের আছে মানুষের জন্য! আমি এদের ভেড়া

কাটতে দেখেছি। মেয়েরা বাটি ভরে তাজা রক্ত নেয়, আর ছাতু খায় সেই রক্ত মেখে। একবার আমাকে খেতে দিয়েছিল, আমি অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়েছিলুম।

পাঁচজনের পরামর্শে তবু এদেরই আশ্রয় নিয়েছি। এরা নাকি আশ্রিতের গলায় চট্ করে ছুরি দেয়না। তারপর সঙ্গে নেরেভুর স্ত্রী আছে। মেয়েদের সামনে খুন জখমের রেওয়াজ নেই। লাসা ছাড়বার আগে এক তিব্বতী বন্ধু এইসব পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাঁর উপদেশ শিরোধার্য করেছি।

পেম্‌বা কখন আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল টের পাইনি। টের পেলুম সামনের তাঁবুর বুড়ো লামার দিকে চেয়ে। কুয়াশার ঘোর তত গভীর নয়। অনেক ফিকে হয়ে এসেছে। রাস্তার ওপিঠের লোক দেখতে তেমন অসুবিধা হচ্ছে না। লামাকে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলুম।

প্রথমটায় মনে হয়েছিল, বুঝি তাঁর ছোট ছোট চোখে আমার দিকেই চেয়ে আছেন। খানিক পরেই সে ভুল ভাঙল। তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখলুম, তিনি পেম্‌বাকে লক্ষ্য করছেন গভীর আগ্রহ নিয়ে। রাতে তাঁরা কখন এসে তাঁবু খাটিয়েছেন খেয়াল করেনি। বিকেলের পর থেকে কত লোকই তো এমনি করে আসতে থাকে। একজনকে দেখে আর একজন যাত্রা ভঙ্গ করে, তাঁবু খাটায়। সকলের সঙ্গেই একপাল লু আর ইয়াক আছে। তারাই মাল বয়, দুধ দেয়। দুটো একটা খিও থাকে পাহারার জন্য। ভেড়া চমরি আর কুকুর আর গোটা কয়েক চাকর। মাইনে করা চাকর নয়, ক্রীতদাস। বাপে ধার নিয়ে শোধ দিয়ে যেতে পারেনি, ছেলে বেগার খেটে ঋণ শোধ করছে। মালিকের হুকুম পেলে তারাই মালপত্র নামাবে ইয়াকের পিঠ থেকে, তাঁবু খাটাবে। চোঙ্গার ভিতর চায়ের সঙ্গে নুন মাখন মিলিয়ে সুজা বানাবে। তারপর শুকনো মাংসের সঙ্গে মদের বাটি দেবে এগিয়ে। রাতে পাহারা দেবে। তারপর আবার তাঁবু তোলা, ইয়াকের পিঠে

মাল বাঁধা, আর গান গাইতে গাইতে পথ চলা।—ইয়া ইয়া গু্য গু্য জের।

আমার দিকে চোখ পড়তেই লামা অপ্রতিভ হলেন। আমি যে তাঁকে লক্ষ্য করছি, তা তিনি দেখতে পাননি। এবারে দেখতে পেয়েই তার বুকের ভিতর থেকে মণিচক্র বার করলেন। আর ডান হাতে ঘোরাতে লাগলেন অর্ধনিমিলিত নেত্রে। আমাদের দেশে যেমন মালা জপের রীতি, তিব্বতে তেমনি মণিচক্র। এই মণিচক্রের ভিতর তিব্বতের ইষ্টমন্ত্র 'ওঁ মণিপদ্মে হুঁং' লেখা আছে একলক্ষ বার, একবার ঘোরালে তাই লক্ষ জপের ফল। লামা নিবিষ্ট মনে তাঁর চক্র ঘোরাতে লাগলেন।

কোনও এক শনিবারে জন্ম, তাই নাম হয়েছে পেম্‌বা। অল্পদিন বিয়ে হয়েছে, বয়সও বেশি নয়। কাল নিজেই বলছিল যে তার বয়স হল বাইশ। অল্প বয়সেই বিয়ে হয়েছে বলতে হবে। লামার চাহনি দেখে কী বুঝল সেই জানে, বলল: অমন করে কী দেখছে বলতে পার?

সবে পরিচয় হয়েছে, তবু রহস্যের লোভটুকু ছাড়তে পারলুম না। বললুম: তোমাকে দেখছে।

আমি কি দেখবার জিনিষ?

হেসে বললুম: তা না হলে দেখবে কেন!

সামনে দিয়ে ইয়াক তাড়িয়ে একটা দল চলেছিল। একটা চাকর তার ভাঙ্গা গলায় গান গাইছে টেনে টেনে।—

ছো পো লেহ-তোঙ শর নেঅ
ঙা ডো তাঙ্ নে ইয়োঙ ইয়োঅ
নে ছেন্ পো তা লা রু
ক্রী মা শর জে লেব ছ্যান
সো সো সু—

যতক্ষণ লোকটা সামনে দিয়ে গেল, ততক্ষণ কথা কইতে পারলুম না। দূর থেকেও তার গানের শব্দ আসছে: সো সো সু—

একসময় আমাদের তাঁবুও ভাঙল। উঠল ইয়াকের পিঠে। আমরাও যাত্রা করলুম, রাত্রি তখনও প্রভাত হয়নি।

নেরেভুরা আমায় হিন্দু বলে ডাকতে শুরু করেছে। বলল: হিন্দু, তোমাদের দেশেও কি লোকে এমনি করে পথ চলে?

বললুম: এককালে চলত, এখনও অনেক জায়গায় চলে। তবে আর বেশিদিন চলবে না।

পায়ে না হেঁটেও যে পথ চলা যায়, নেরেভু এই গল্প শুনেছে ভুটিয়া ব্যবসায়ীদের কাছে। বলল: তোমাদের দেশ একবার দেখতে ইচ্ছে করে।

বললুম: চলনা আমার সঙ্গে।

নেরেভু বুঝি চমকে উঠল, কথা কইল না।

বললুম: ভয় পেলে নাকি?

ভয়! ভয় কিসের: নেরেভু জবাব দিল: কিন্তু যাই বললেই কি যাওয়া যায়! পেম্‌বা সঙ্গে আছে, বাপের অনুমতি নেয়া হয়নি, তার ওপর এত জিনিষপত্র!

তা বটে।

পেম্‌বা বলল: আসল কথা অন্য। তোমার কাছে ও লুকোচ্ছে।

তাই নাকি?

কৌতুকের হাসি হেসে পেম্‌বা বলল: বলনা সত্যি কথা।

সত্যি কথা বলতে আমি ডরাই নাকি: উত্তর দিল নেরেভু: কোথাও গেলে আমি পেম্‌বাকে সঙ্গে নিয়েই যাব।

পেম্‌বা বলল: এবারে যা কাণ্ড করল, ফিরে গিয়ে আমি কাউকে মুখ দেখতে পারবনা।

তাই নাকি!

আমি বিস্ময় প্রকাশ করলুম।

পেম্‌বা আমাকে তার লজ্জার কথা শোনাল। বলল: ওরা তিন

ভাই। ছোটটা এখনও নাবালক। তার বদলি আছে ওদের বাপ, বিপত্নীক সে।

তিব্বতী শাস্ত্র মতে পেম্‌বার উপর এদের সবার সমান অধিকার। মেয়েরা ছোট থেকেই একথা জানে। তাই এই অদ্ভুত সমাজ-ব্যবস্থায় সহজেই নিজেকে মানিয়ে নেয়।

পেম্‌বা বলছিল: এর বাপেরই আসবার কথা ছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে কেন বদলাল, একেই জিজ্ঞেস কর।

বলে হাসতে লাগল

নেরেভুর মুখ দেখে মনে হল, এ প্রসঙ্গ সে চাপা দিতে চায়। পিছনে শব্দ শুনে এই সুযোগ সে পেয়ে গেল। ইয়াকের পিঠে চড়ে সেই লামা আমাদের ধরে ফেললেন। নেরেভু নত হয়ে তাঁকে নমস্কার জানাল: চাক্‌ ওয়াং।

লামা খুশী হলেন। ঝপ করে নেমে পড়লেন ইয়াকের পিঠ থেকে। আশীর্বাদ শুধু নেরেভুকেই নয়, আমাদেরও করলেন।

লামাকে এইবারে ভাল করে দেখলুম। যত বুড়ো মনে হয়েছিল, ততটা নন। মাঝবয়সীই বলা উচিত। মুখের ভাব বড় রুক্ষ, বড় অপ্রসন্ন। আর দশজন লামার মত সৌম্য স্নিগ্ধ স্মিতদর্শন নন। তবে কথাগুলি মিষ্টি। বললেন: তোমরা ভাগ্যবান। বুদ্ধ তোমাদের আশীর্বাদ করবেন।

নেরেভুর সারামুখ খুশিতে উজ্জ্বল হল। আরও কিছু শোনবার জন্য নিঃশব্দে আগ্রহ প্রকাশ করল।

পেম্‌বার দিকে চেয়ে নেরেভুকে প্রশ্ন করলেন: তোমার স্ত্রী?

গদগদভাবে নেরেভু মাথা নাড়ল।

চোখ জোড়া ছোট করে লামা হাসলেন: সেইজন্যেই বলেছিলুম তোমরা ভাগ্যবান। তোমাদের ঘরেই বুদ্ধ আবার জন্ম নেবেন।

চলতে চলতে নেরেভু দাঁড়িয়ে গেল। বিহ্বল হল তার দৃষ্টি।

লামা আবার ইয়াকের পিঠে লাফিয়ে উঠলেন। সবাইকে ফেলে হ্যাট হ্যাট করে এগিয়ে গেলেন।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত নেরেভু কোন কথা কইতে পারল না। কথা কইল পেম্‌বা, বলল : ছেলেবেলায় আর এক লামাও আমায় এই কথা বলেছিলেন। তখন থেকে—

নেরেভুর চোখের দিকে চেয়ে পেম্‌বা থেমে গেল।

আমি জানি, পেম্‌বা কী বলতে গিয়ে চেপে গেল। এদের সঙ্গে দীর্ঘদিন কাটিয়ে এই সত্যটুকু জেনেছি। এ দেশের মেয়েরা বুদ্ধের মা হবার স্বপ্ন দেখে। ভাবে তার নারী জীবন সার্থক হবে বুদ্ধকে কোলে পেলে। তাই তারা লামার ঘরণী হতে চায়। বিশ্বাস করে যে নেরেভুর মতো সাধারণ পুরুষের নেই বুদ্ধের জনক হবার পবিত্র অধিকার। কিন্তু নেরেভুকে একথা বলা চলে না।

পাথরের মতো কঠিন রুক্ষ পথ। সবুজের আমেজ নেই কোন দিকে। দক্ষিণ থেকে শীতল হাওয়া আসছে, বুকের হাড় কাঁপানো হাওয়া। কুয়াশা কেটে গিয়ে আলো ফুটছে। কিন্তু প্রাণে শান্তি নেই। এই আলো দেখতে দেখতে তীব্র হবে, চোখে জ্বালা ধরাবে, চোখ মেলে আর চলতে দেবে না। হাওয়াতে তো সূচের মতো ধার। দেহের অনাবৃত অংশ ফেটে ফেটে রক্ত ঝরবে। জীবন তো নয়, এ যেন নরক বাস। তবু ভাল লাগে।

নেরেভু অনেক এগিয়ে গিয়েছিল। কিংবা আমিই পিছিয়ে পড়েছিলুম। পেম্‌বা তারই সঙ্গে ছিল। ছোট একটুখানি জলের ধারা পেরবার সময় একখানা পাথরের উপর বসে পড়ল। আমি কাছে আসতে আমাকেও বসতে বলল।

জলের ধারার কাছে গোটা কয়েক কাঁটার গাছ গজিয়েছিল। এখন শুধু ডাঁটা আর কাঁটাই দেখতে পাচ্ছি! পাতা যা ছিল, তা ইয়াকগুলো মুড়িয়ে খেয়ে গেছে। সেই দিকে চোখ রেখে পেম্‌বা

বলল : তুমি হিন্দু, বিদেশী। তোমাকে বলতে তো বাধা নেই। আমি একজন লামাই বিয়ে করতে চেয়েছিলুম।

তাই নাকি!

আমি তার গল্প শোনবার জন্য উৎসাহ জানালুম।

পেম্‌বা বলল : সত্যি বলছি। আমাদের গ্রামে ছিলেন এক বুড়ো লামা! তিনি তো হেসেই আকুল। বললেন, আমায় বিয়ে করবি? তারপর বোঝালেন ভাল করে, সংসার ছেড়েছে বলেই তো লামা। মঠ ছেড়ে সংসার পাতলে সেকি আর লামা রইল! সেও তখন সাধারণ মানুষ।

একটু থেমে পেম্‌বা বলল : আমি তাই বুঝেছিলুম হিন্দু। কিন্তু এখন অন্য রকম দেখছি।

আমি আশ্চর্য হলুম তার কথা শুনে। বাকিটুকু শোনবার জন্যে তার পাশে আর একখানা পাথরের ওপর বসলুন।

পেম্‌বা বলল : এখন দেখছি, সংসার করতে লামারা তো ধর্মত্যাগ করেন না। এই তো সেদিন ঠং ডু জাতের একটা মেয়ে এক লামাকে বিয়ে করল। কী সুখে সে ঘর করছে দেখে এলুম।

হঠাৎ আমার মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল : তোমাদের দেশেও কি মেয়েদের অনেক স্বামী থাকে?

বড় বিষণ্ণ দেখলুম পেম্‌বার দৃষ্টি। মনে হয়, সত্যি কথা শুনলে সে আরও দুঃখ পাবে। বললুম : দ্রৌপদীর পাঁচজন স্বামী ছিল।

উত্তরে পেম্‌বা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।

সামনের ইয়াকগুলোকে আর দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু বাঁকের কাছটায় নেরেভুকে দেখা গেল। রাস্তার পাশের উঁচু জমিটায় হেলান দিয়ে সে বুঝি আমাদেরই অপেক্ষা করছে। বললুম : চল, এবারে এগোন যাক।

এ দেশের মেয়েদের দুর্বলতার কথা আমি জানি, জানি তাদের ধর্মান্ধতার কথা। ছেলেরা জন্মেই স্বপ্ন দেখতে শুরু করে লামা হবার।

শৈশবে খানিকটা কৃচ্ছ্রসাধন করতে পারলেই সারা জীবন সুখে কাটাবার সনদ পাওয়া যাবে। সংসার সুখ? সাধ থাকলে সেও ভাগ্যে জোটে। রাজা হবার দায়িত্ব আছে অনেক, লামার শুধু সুখ। সাধারণের ধারণা তো এই।

আর মেয়েদের কথা?

শুনেছি অনেক, দেখেছিও কিছু। মেয়েদের চোখে লামা যেন মানুষ নয়, বুদ্ধের অবতার তারা। লামার তৃপ্তির চেষ্টায় তিব্বতী মেয়ের কোন সঙ্কোচ নেই, নেই লজ্জা! দেহ তো পূজার নৈবেদ্য, মন আরাধনার মন্ত্র। কুমারী মেয়ের পাগলামির কথা শুনেছি, শুনেছি বিবাহিত নারীরও কথা! কিন্তু বিস্মিত হয়েছি এদের স্বামীদের কথা শুনে। স্ত্রীর উচ্ছৃঙ্খলতায় তারা নাকি আত্মপ্রসাদ পায়। বংশ পবিত্র হল বলে স্ত্রীকে সম্মান করে, সমাজে প্রতিষ্ঠা খোঁজে। এত বাড়াবাড়ি আমার বিশ্বাস হয় না।

সন্ধ্যেবেলায় নেরেভুকে বড় বিচলিত দেখাল। তাঁবুর বাহিরে বসে আমি এক বাটি স্তজা খাচ্ছিলুম। নুন মাখন মেলানো তিব্বতী চা। ব্যস্তসমস্ত ভাবে নেরেভু এসে ধপ করে বসে পড়ল। বললুম: কী হল?

বলবার জন্যেই নেরেভু এসেছিল। বলল: দুপুরের সেই লামা ঢুকেছে পেম্‌বার তাঁবুতে।

বললুম: তার জন্যে ভাবনা কিসের?

ভাবনা! বলতে গিয়ে নেরেভুর গলা কেঁপে গেল।

সাহস দিয়ে বললুম: লামা তোমাদের ধর্মগুরু, তোমাদের ভালই হবে।

নেরেভুর একথা বিশ্বাস হলনা। বলল: এ আমাদের গ্রাম নয় হিন্দু, এ আমাদের বাণিজ্যের পথ। এ পথে স্বার্থ নিয়ে সবাই বেরিয়েছে।

বললুম: তীর্থ যাত্রারও এই পথ। মঙ্গলও এই পথে আসবে।

নেরেভু উত্তর দিলনা। কিন্তু তার দুর্ভাবনা জেগে রইল তার অশান্ত মনে।

কয়েক চুমুকে চায়ের বাটিটা নিঃশেষ করে মাটিতে নামিয়ে রাখলুম। বললুম: তুমি ভয় পাচ্ছ কেন?

ভয় পাবনা: রুদ্ধশ্বাসে জবাব দিল নেরেভু: ওরা কী বলল জান?

বললুম: কারা?

কেন, ঐ যাদের সঙ্গে লামা আসছে।

বলে একখানা তাঁবু দেখিয়ে দিল।

জিজ্ঞাসা করলুম: কী বলল তারা?

একটা মুহূর্ত ইতস্তত করল নেরেভু। তারপর বলল: পুরাংএর মণ্ডিতে সব বেচে দিতে বলছে। ও নাকি গুণে দেখেছে যে পুরাংএর মণ্ডিতে সব বেচে দিয়ে গ্যানিমার মণ্ডিতে জিনিষ কিনলে লাভ বেশি হবে ওদের।

তাতে ভয় পাবার কী আছে?

ভয় পাবার নেই: আমার প্রশ্ন শুনে নেরেভু আশ্চর্য হল, বলল: হাতে টাকা নিয়ে এত পথ চলা যায়?

আমি হাসলুম তার ভাবনার কথা শুনে। বললুম: আমাদের দেশে জিনিষ নিয়েই লোকে চলতে চায় না, বলে ঝামেলা।

এ দেশে টাকা নিয়ে চলা যে নিরাপদ নয়, তা বেশ বুঝি। তবু তাকে সাহস দেবার জন্যই নিজের দেশের কথা বললুম। পকেটে টাকা নিয়ে চলা আমাদের দেশেও নিরাপদ নয়।

নেরেভু আপত্তি জানাল, বলল: তোমাদের দেশের কথা রাখ।

তারপর তার শৈশবের এক গল্প শোনাল আমাকে। বলল: ছেলেবেলায় একবার বাবার সঙ্গে এই পথে এসেছিলুম! আমার মাও ছিল সঙ্গে। ঠিক এমনি করে এক লামা মাকে বুঝিয়েছিল পুরাংএর মণ্ডিতে সব বেচে দেবার কথা। পুরাং ভারতের কাছে, লোকেরা জিনিসের বেশি দাম দেয়। তারপর—

নেরেভুর ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল।

তারপর?

একটু সংযত হয়ে নেরেভু বলল: আমরা সব হারালুম। জলের দরে ইয়াক আর ভেড়াগুলো বিক্রি করে আমরা দেশে ফিরে এলুম।

হেসে বললুম: সেবারে হয়েছিল বলে যে এবারেও হবে, তাই বা কেন ভাবছ?

না না, তুমি জানো না। এই সব লামাদের কথা শুনলেও বিপদ, না শুনলেও বিপদ।

মাংস আর মদ নিয়ে এদের চাকর ঢুকছিল পেম্‌বার তাঁবুতে। দরজা ফাঁক করতেই ভিতর থেকে হাসির শব্দ এল। লামার সঙ্গে পেম্‌বাও হাসছে! অন্ধকারেও স্পষ্ট দেখলুম, নেরেভু শিহরে উঠল!

বললুম: বেজায় শীত পড়েছে আজ, তাই না?

নেরেভু উঠে দাঁড়িয়েছিল, বলল: চল ভেতরে যাই।

ভিতরে গিয়েও শীত কমল না। কম্বলে আজ শীত মানবে না। পেম্‌বার টুকটুক আছে তারই তাঁবুতে। দশ বারো সের ওজন, শক্ত কাপড়ের লেপ। গরমের চেয়ে দুর্গন্ধ বোধহয় বেশি। নেরেভুর শোক উঠল ঐখানার জন্য! বলল: লামা আজ টুকটুকের ভাগ বসাবে না তো!

প্রথমটায় সেই সন্দেহই হয়েছিল। খাওয়া আর গল্প তাদের শেষ হয় না যেন। আমরা কখন খেয়ে নিয়েছি। অন্যদিন হলে হয়তো ঘুমিয়েই পড়তুম। কিন্তু নেরেভু জেগে রইল। একবার গিয়ে দেখেও এল পেম্‌বার তাঁবুর ভিতর উঁকি দিয়ে। ফিরে এসে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। বললুম: কী হল?

নিরাসক্তভাবে নেরেভু উত্তর দিল: মেয়েটার নেশা ধরে গেছে।

শেষ পর্যন্ত লামা বিদায় নিলেন। চাকর সেই সংবাদ দিয়ে গেল। সারাদিনের শ্রান্তিতে নেরেভুর তন্দ্রা এসেছিল। ধড়মড় করে উঠে বসল। বলল: টুকটুক খানা? ও, পেম্‌বার তাঁবুতে আছে!

উঠে দাঁড়িয়ে তার নিজের কম্বল দুখানা আমার গায়ের উপর ফেলে দিল। বলল: তুমি ঘুমোও হিন্দু, আমি পেম্‌বার কাছেই যাই।

বলেই বেরিয়ে গেল।

আমি আশ্চর্য হই এই ভেবে যে এত অল্প সময়ে এত ঘনিষ্ঠতা হয় কী করে। লামা বলেই বোধহয় এই অসাধ্য সাধন সম্ভব হয়।

পথ চলতে চলতে নেরেভুকে সেই কথা জিজ্ঞাসা করি। বলি: আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দেবে?

উত্তর না দিয়ে নেরেভু আমার মুখের দিকে তাকাল।

পেম্‌বা আজ এগিয়ে চলেছে, লামার সঙ্গে ইয়াকের পিঠে চড়ে। তাদের দেখিয়ে বললুম: পেম্‌বার সঙ্গে আমি যদি এমন ভাব করতুম, তুমি আমায় সহ্য করতে?

নেরেভু গম্ভীর হয়ে রইল, কোন উত্তর দিলনা।

বললুম: নিশ্চয়ই সইতে না।

নেরেভু সংক্ষেপে বলল: আমরা খামের লোক।

কেটে ফেলতে, না?

আরও গম্ভীর গলায় নেরেভু উত্তর দিল: তোমার কল্‌জের রক্তে একবাটি ছাতু মেখে খেতুম।

তার বলার ভঙ্গিতেই আমার গা শিহরে উঠল। বুঝতে পারলুম, লোকটার বুকের রক্তে আগুন লেগেছে। রক্ত ভিজে বলেই নিবে আছে, সময় লাগছে জ্বলে উঠতে।

কদিন ধরেই পেম্‌বার পরিবর্তন আমি লক্ষ করছি। নূতন জামা পরেছে, রুক্ষ চুলে কড়ির মালা জড়িয়েছে। রঙ মেখেছে মুখে, থিকথিকে ময়লার উপর লাল রঙ। তার নোংরা দাঁত বেরিয়ে পড়ছে কথায় কথায়।

নেরেভুও যে এই পরিবর্তন লক্ষ্য করেছে, তাতে সন্দেহ নেই। সারাক্ষণ তাকে বড় বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। কথা না বলালে কথা কইতে চাইছেনা। খটখটে রাস্তার উপর হোঁচট খেয়েছে বার কয়েক, সাবধান হয়ে পিছিয়ে পড়েছে বার বার।

বললুম : লামার খবর কিছু রাখ ?

নেরেভু চমকে উঠল।

বললুম : শুনেছি, রেতাপুরীর লামা, কৈলাস হয়ে রেতাপুরী চলে যাবে।

নেরেভু উত্তর দিল না !

বললুম : ফেরার পথে তোমার ভাবনা নেই। আমিও থাকবনা, লামাও খসবেন।

উত্তরে নেরেভু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

বললুম : কথা বলছ না যে ?

নেরেভু তবু নিরুত্তর।

ভাবছ, কৈলাস অনেক দূর। দূর আর নয়! লামা বলছিল সামনেই পুরাংএর মণ্ডি। আর পুরাং থেকেই তো কৈলাসের পথ।

পুরাং এর নামে ক্ষেপে উঠল নেরেভু। বলল : পেম্‌বা কী জেদ ধরছে জানো ? বলছে, পুরাংএর মণ্ডিতে সব সওদা বেচে দিতে ! বলছে, লামা গুণে বলচেন, আমাদের লাভ হবে।

আমি তাকে অভয় দিলুম, বললুম : তাতে কী হয়েছে, লাভ না হলে বেচবেনা।

বেচবনা। অমান্য করব লামার কথা ! পেম্‌বা বলছে, তাহলে বংশে বাতি দিতে কেউ থাকবেনা।

এই মুহূর্তে আমার মনে হল, নেরেভু যেন খামের লোক নয়। বাংলাদেশের শিশু যেমন জুজুর ভয়ে মায়ের বুকে মুখ লুকোয়, নেরেভুও তেমনি একটা আশ্রয় খুঁজছে। চারিদিকের পাহাড় আর পাথরের

দিকে চেয়ে সেই আশ্রয়ের আশ্বাস কোথাও পাচ্ছেনা। ভিতরে ভিতরে তাই সে আজ গুমরে উঠছে।

তাহলে সঙ্গে সঙ্গে কিনেও ফেলো।

আমি পরামর্শ দিলুম।

তোমার কথামত তো আমি চলতে পারিনা, লামার অন্য আদেশ। যতদিন গ্যানিমার মণ্ডি না পৌঁছচ্ছি, ততদিন সমস্ত টাকা পেম্‌বার কাছে গচ্ছিত থাকবে।

তাহলে আর ভাবনা কী?

গম্ভীরভাবে নেরেভু বলল: সেইজন্যেই তো ভাবনা। মদ খেয়ে পেম্‌বা আজকাল বেহুঁস হচ্ছে।

পরক্ষণেই তার ছুচোখ জ্বলে উঠল। দাঁতে দাঁত চেপে বলল: আমি খামের লোক!

এ সত্যের পরিচয় নেরেভু এখনও দেয়নি। দিল পুরাংএর মণ্ডিতে পৌঁছে।

সকালবেলায় বেশ ভাল দরেই তার জিনিস বিক্রি হচ্ছিল। উল, চামর আর চমরীর মাখন। ভাল দর পাচ্ছে দেখে আমারও ভাল লাগছিল। কিন্তু দুপুরে খাবার সময় চমকে উঠলুম। একজন চাকর পাথরের উপর একখানা চকচকে ছুরিতে শান দিচ্ছে।

কী হচ্ছে রে?

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলুম।

লোকটা সংক্ষেপে উত্তর দিল: মালিকের হুকুম।

এত বড় ছুরি দিয়ে কী হবে?

লোকটা তার নোংরা দাঁত বার করে হাসল খানিকক্ষণ। তারপর বলল: আজ একটা ভাল ভেড়া কাটবেন, বলেছেন মালিক।

তার হাসিটা কেমন রহস্যজনক। ভয়ে আমার গলার ভিতরটা শুকিয়ে উঠল।

নেরেভুকে সারাদিন আজ ব্যস্ত দেখছি। সমস্ত মণ্ডি ছুটোছুটি

করে বেড়াচ্ছে, এসব মণ্ডিতে লোকে শুধু জিনিস বেচতে আসেনা। বেচা কেনা দুই-ই হয়। নগদ টাকার কারবার কম। তাইতেই বোধহয় নেরেভুকে বেশি ছুটোছুটি করতে হচ্ছে।

খানিকক্ষণের জন্য পেম্‌বার দেখা পেয়েছিলুম। বড় হাসিখুসি ভাব তার। কিছুদিন আগে হলে হয়তো ভাল লাগত। কিন্তু আজ লাগল না। তবু তাকে ডাকলুম, বললুম : আমার কাছে একটু বসবে?

পেম্‌বা কাছে এসে পাশে বসল, বলল : তুমি নাকি চলে যাচ্ছ?

বললুম : তা যাচ্ছি। তোমরা খাং রিমপোছে যাবে গ্যানিমা গিয়া কার্কো হয়ে। আমি যাব সোজা পথে, সো মাফম্‌ আর রাক্ষসতালের মাঝখান দিয়ে। কিন্তু যাবার আগে তোমায় একটা কথা বলে যাব।

পেম্‌বা আমার মুখের দিকে তাকাল।

বললুম : তুমি ভুল করছ। বুদ্ধের বাপ মা ছিলেন তোমার আমার মতো সাধারণ মানুষ। তাঁকে আনা যায়না, তিনি নিজে আসেন।

পেম্‌বা যে বিরক্ত হচ্ছে, তা স্পষ্ট দেখতে পেলুম। তবু বললুম : তুমি সত্যিই ভুল করছ।

কিন্তু পেম্‌বা আমাকে আর কিছু বলবার অবকাশ দিলনা। দুচোখে বিরক্তি ছড়িয়ে আমার কাছ থেকে সরে গেল।

সন্ধ্যাবেলায় ক্লান্ত দেহে নেরেভু আমার পাশে এসে বসে পড়ল। বলল : ওরা কোথায়?

আমি আঙুল দিয়ে পেম্‌বার তাঁবু দেখিয়ে দিলুম।

চাকর স্যুজা এনেছিল বাটিতে করে। এক চুমুকে বাটি নিঃশেষ করে ধমক দিল। বলল : গরম স্যুজা।

চাকর গরম চায়ের জন্য ছুটল।

আমার দিকে চেয়ে বলল : খবর পেয়েছি, ডাম গিয়াশোর লোক। নাম শাবডুং লামা। ডাম গিয়াশোর লোক তো আমাদেরই মতো খুনে ডাকাত বলে জানি।

বললুম : তাই নাকি !

উৎসাহ পেয়ে নেরেভু বলল : বাকি খবরটুকুও পেয়ে যাব। সেখানকার লোক আছে আমার চেনা। তারা তাঁবুতে ফিরুক।

নেরেভু সত্যিই এক সময় তাদের খবর আনল। একেবারে মার-মুখো হয়ে এল। বলল : আমার ছুরি কই ?

চাকর তৈরিই ছিল। চক্ষের নিমেষে ছুরি এনে হাজির করল।

আমি কী করব ভেবে স্থির করবার আগেই উন্মাদের মতো পেম্‌বার তাঁবুতে ঢুকল নেরেভু। তার পরেই ছুটে বেরিয়ে গেল।

ভেবেছিলুম, সব শেষ করে দিয়েছে। কিন্তু চাকরদের মুখে অন্য কথা শুনলুম। লামা পালিয়েছে। পেম্‌বাকেও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

অনেক রাত অবধি আমরা জেগে রইলুম। কেউই ফিরল না। শুধু সামনের তাঁবুর লোকেরা লামার খোঁজ করতে এসেছিল। খবর শুনে স্তম্ভিত হয়ে ফিরে গেল। তার কিছু পরেই কান্নার শব্দ পেলুম। চাকরেরা খবর আনল, তাদের টাকাকড়ি সব চুরি গেছে।

পুরাংএর মণ্ডিতে আরও কয়েকদিন ছিলুম। চাকরেরা আমার কাছে হুকুম চাইছে তাঁবু তোলবার, আর তা না পেয়ে বিরক্ত হচ্ছে। বলছে : এদেশে যারা যায়, তারা আর ফেরে না। শুধু শুধু সময় নষ্ট করে লাভ কী ?

সেদিন শেষ রাতে চলবার হুকুম দিলুম। তাদের আনন্দ আর ধরে না। খট খট শব্দে তাঁবু তুলতে লেগে গেল। গান গাইতেও জানে একটা লোক। টেনে টেনে সুর ধরল : ইয়া ইয়া গ্যু-গ্যু জের।

এক সময় তাঁবু তোলা শেষ হল, শেষ হল ইয়াকের পিঠে বোঝা বাঁধা। ঝুপ করে বসে পড়ে মুখ ভেঙিয়ে তারা ছাক্‌ওয়াং জানাল। তাদের দেশী প্রথার প্রণাম। তার পরেই ইয়াক তাড়িয়ে এগিয়ে চলল।

এক রকমের অদ্ভুত বেদনায় আমার বুকের ভিতরটা মুচড়ে উঠল। কিন্তু সেই লোকটা গান গাইছে টেনে টেনে :

ছো পো লেহ-তোঙ শর নেঅ
ঙা ডো তাঙ্ নে ইয়োঙ ইয়োঅ
নে ছেন্ পো তা লা রু
ক্রী মা শর জে লেব ছ্যুন
সো সো স্যু —

গল্প যদি এইখানেই শেষ করতে হত, তাহলে এত কষ্ট করে এতখানি লিখতুম না। আমি তো লেখক নই। লেখক হলে এতদিন একখানা আস্ত ভ্রমণ-কাহিনীই লিখে ফেলতুম। সেদিন একখানা ছবি দেখে এই গল্প মনে পড়ে গেল। আমার এক ফটোগ্রাফার বন্ধুর দোকানে বসে আড্ডা দিচ্ছিলুম।

কৈলাস-ফেরৎ এক ভদ্রলোক খান কয়েক ছবির ডেলিভারি নিতে এসেছিলেন। কৈলাসের ছবি শুনে আমার কৌতূহল হল। তাড়াতাড়ি ছবিগুলো দেখে দেবার সময় বুকের ভিতরটা হঠাৎ ছ্যাঁৎ করে উঠল। একটি পাগলের ছবি। বললুম : একটু বসবার সময় হবে কি আপনার? বেশি না, মাত্র মিনিট পাঁচেক।

আশ্চর্য হলেও ভদ্রলোক বসলেন।

আমি আমার বন্ধুর সহকারীকে নেগেটিভ দিলুম এনলার্জ করবার জন্য।

মিনিট কয়েক পরেই ভিজে ছবি হাতে এল। ঠিকই ধরেছি। ফটোগ্রাফারের চোখই কি শুধু ক্যামেরার লেন্সের মতো?

ছবিখানি এগিয়ে ধরে বললুম : কোথায় নিয়েছিলেন এই ছবি?

ভদ্রলোক ঝুঁকে দেখলেন একটুখানি, তারপর বললেন : কৈলাসের নিচের এক গোম্ফায়, তিব্বতীরা যেখান থেকে দেশে ফেরে। ছুতেন ফুক, না কী নাম গোম্ফার, ভুলে গেছি।

একটু থেমে বললেন : ঝুঁকে পড়ে আমাদের মুখ দেখছিল, আর জড়িয়ে জড়িয়ে কী বলছিল। দোভাষী বলল, বলে, হিন্দু ঠিকই বলেছিল।

আমিও জানতুম, একদিন সে তার ভুল বুঝবে। কিন্তু বড় দেরিতে বুঝল।

পাঁচ

তিব্বত থেকে ফিরে এসে কিছুই ভাল লাগত না। শান্তির লোভে শবরমতীর আশ্রমে এসে আশ্রয় নিলুম। তখন বুঝতে পারিনি যে সারা জীবনটা সেখানে কাটানো সম্ভব হবে না। পোরবন্দরে একটা চলনসই কাজ পাবার আশ্বাস পেলুম ছোট মামার কাছ থেকে। চাকরির চেষ্টাতেই সেখানে গেলুম, মহাত্মাজীর জন্মস্থান দর্শনে নয়।

আপশোস করে ছোট মামা বললেন : ওরে, এম্-এস্-সির নোট মুখস্ত না করে মোট বওয়া অভ্যাস করলে পেটের জন্য আর তোকে ভাবতে হত না। সাহেবরা চলে যাবার পর সবাই আমরা উপদেষ্টা আর নিরীক্ষক হয়েছি। তোরাও কাজ করতে না চাইলে কাজের লোক বিদেশ থেকে আমদানি করতে হবে।

অফিসে ধাক্কা খেয়ে এলেই ছোটমামা এইসব বলেন। উত্তর না দিয়ে আমি তাঁর মন্তব্য শুনি।

এক একদিন মহাত্মাজীর কীর্তিমন্দিরের পাথরের চাতালে এসে বসতুম। সাঁইত্রিশ লক্ষ টাকা ঢেলে শেঠ নানজী কালিদাস এই কীর্তি মন্দিরটি তুলেছেন মহাত্মাজীর জন্মভূমির উপর। দেশী ও বিদেশী দর্শকের জনস্রোত তীর্থের মতো মুখর করে রেখেছে মন্দিরের প্রাঙ্গন। বসে বসে তাদের যাওয়া আসা দেখি।

দূরে পাথরের ধাপে বসে একটা খোঁড়া মেয়ে ভিক্ষে চাইত। তার জীর্ণ বসনের আড়ালে লোকে শুধু তার দারিদ্র্যই দেখতনা, ব্যর্থ যৌবনও দেখত ফিরে ফিরে।

কদিন ধরে আমিও মেয়েটিকে দেখছিলুম। হঠাৎ একটা অদ্ভুত ভাব এল মনে। মনে হল, কোথায় যেন তার সঙ্গে আমার একটা যোগ আছে। তার বাঁ পা-টা খোঁড়া না হলে সে আজ অমন করে ভিক্ষে চাইতে বসতনা। কোন কাথিয়াবাড়ী তরুণের সংসার ভরে দিত স্নেহে ও মমতায়, নারী জীবনের সার্থকতায় আনত সৃষ্টির আনন্দ। আমার পা খোঁড়া না হয়েও আমি খুঁড়িয়ে চলছি। ও মেয়েটির মতো আমিও পরের মুখাপেক্ষী। মিল আছে বৈকি দুজনের জীবনে।

কিন্তু মনের দিক থেকে গড় মিল আমাদের দুস্তর। ভগবানের অভিশাপ তাকে পঙ্গু করেছে, তার জীবনকেও। সেইখানে তার সান্ত্বনা। ভাগ্যকে আমিও ভর্ৎসনা করি, কিন্তু ভগবানের দোষ দেখিনা বলে আমার সান্ত্বনা নেই।

সকাল বেলায় মহাত্মাজীর কথা তুলেছিলেন ছোট মামা। বলছিলেন ঃ গান্ধীজী তোদের জন্যে কিছু করে গেলেন না!

তিনি কী করবেন বল?

কেন, আমরা যে শুনেছিলুম—

ঠিকই শুনেছিলেন ছোটমামা। মহাত্মাজীর নোয়াখালি যাবার সময় তাঁর কাছে গিয়ে আমি কেঁদে ফেলেছিলুম। মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে তিনি সান্ত্বনা দিয়েছিলেন, মরব না রে মরব না। তোদের জন্যেই আবার ফিরে আসতে হবে। তোদের একটা ব্যবস্থা না করে কি পালিয়ে যেতে পারি?

ফিরে তিনি এসেছিলেন, কিন্তু দেশের লোকই তাঁকে তাঁর কথা রাখতে দেয়নি। তার জন্য দুঃখ নেই। অত বড় একটা ক্ষতি সইতে পারল সারা পৃথিবী আর আমি ভাবব আমার নিজের ক্ষতির কথা!

একদিন একজন মার্কিণ ভদ্রলোক কীর্তিমন্দিরের ছবি নিচ্ছিলেন ঐ খোঁড়া মেয়েটিকে সামনে রেখে। তারপর কাছে এসে আরও বড় করে মেয়েটির ছবি নিলেন। জড়োসড়ো হয়ে সে তার লজ্জা নিবারণের চেষ্টা করল। ক্যামেরা বন্ধ করে ভদ্রলোক একটা সিগারেট ধরালেন, কৃতার্থ হবার চিহ্ন দেখলুম তার চোখে মুখে। দেশে গিয়ে দেখাবার মতো কিছু মজার খোরাক পাওয়া গেছে, এমনি ভাব।

সব দেখে শুনে ভারতীয়দের একটি দল ফিরছিলেন। প্রশংসা তাঁদের মুখে আর ধরে না।—কী অপূর্ব সৃষ্টি, দানের মাহাত্ম্যই বা কী! গভর্ণমেণ্ট এখনও কোন খেতাব দেননি কালিদাসজীকে!

আনন্দে বুক ভরে ওঠার কথা, কিন্তু ওঠেনা। স্বাধীনতার দিনে পূর্ববঙ্গ আর পশ্চিমপাঞ্জাবের মানুষের মতো কান্নায় বুক ভরে যায়। কোথায় একটা ফাঁকির সঙ্কেত পাই, কীর্তিমন্দিরের পাথরে সেই ফাঁকি ঢাকা পড়েনি।

জনকয়েক চীনা যুবক পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাদের সঙ্গে একজন এ দেশের লোকও আছেন।

একজন চীনা যুবক প্রশ্ন করলেনঃ কীর্তিমন্দির কার? মহাত্মাজীর, না নানজী কালিদাসের?

আমি চমকে উঠলুম। এমন প্রশ্ন যেন আর কারও মুখে কোনদিন শুনিনি। ভারতীয়ের সঙ্গে ইংরেজীতে কথা বলছিলেন তাঁরা। আমি কাছে গেলুম আরও কিছু শোনবার জন্য।

কী আছে আমাদের মাও সে তুঙের? তাঁর মতো বিদ্যা বুদ্ধি হয়তো অনেকেরই আছে, কিন্তু অত বড় হৃদয় নেই যে দেশের প্রত্যেকটি লোককে একান্তভাবে আপন ভাববে। কী অভাব তাঁর পয়সার? কিন্তু সাধারণ দরিদ্রের মতো নীল ছাড়া অন্য রঙ উঠলনা তাঁর গায়ে। তোমাদের গান্ধীও তেমনি এক মানুষ যিনি লোকের জন্য ভাবলেন, লোকের জন্য কাঁদলেন, আর লোকের জন্যই জীবন দিয়ে গেলেন। কিন্তু এই কি তাঁর কীর্তিমন্দির? সাঁইত্রিশ লক্ষ

টাকার একটা কারবারে সমস্ত সৌরাষ্ট্রের নিরন্ন লোকের খেয়ে পরে থাকার ব্যবস্থা হতে পারত। ঐ যে খোঁড়া মেয়েটি বাইরের সিঁড়িতে বসে ভিক্ষে চাইছে, আরও যারা হাত পেতে রাস্তার দুধারে বসে আছে পরের মুখ চেয়ে, তাদের কি কিছু করে খাবার সুযোগ দেওয়া যায় না! তাতে হয়তো এই কীর্তিমন্দির উঠত না, কিন্তু সেই মহাত্মার স্বপ্ন সফল হত।

অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিলুম। আবার ফিরে এলুম নিজের জায়গায়।

মনে হল, আমি না থাকলে দেশের ভার খানিকটা লাঘব হত। শুধুই কি তাই? দেশ আরও কিছু পেত আমার মৃতদেহ থেকে। মনে মনে সেই লাভের একটা হিসেব করে ফেললুম। একমন সের তিরিশেক ওজন আমার দেহের। চর্বি থেকে খান সাতেক সাবান হবে। যা লোহা আছে তাতে একটা পেরেক হবে ইঞ্চি দেড়েক লম্বা। কার্বনকে গ্রাফাইট করে নিলে ন হাজার পেনসিলের সীষ হবে অনায়াসে, আর ফসফোরাস দিয়ে দেশলায়ের কাঠি হবে কম করেও বাইশ শো। ক্যালসিয়াম যা পাওয়া যাবে তাতে চুনকাম হতে পারবে একটা হাঁসের ঘর, আর তিন পেয়ালা কফি হবে শরীরের চিনি দিয়ে। সবচেয়ে আশার কথাটি মনে এল সবচেয়ে পরে। অক্সিজেন আর হাইড্রজেন গ্যাস দিয়ে আধ মাইল লম্বা রাস্তাকে আলোকিত করে রাখা যাবে একঘণ্টার উপর। আমরা অন্ধকারেই পড়ে আছি। মৃত্যু না হলে বুঝি এই আলো জ্বলে না!

হঠাৎ চোখে পড়ল যে এক বাঙালী ভদ্রলোক ঐ খোঁড়া মেয়েটির ছবি নেবার চেষ্টা করছেন। মেয়েটি যতই জড়োসড়ো হচ্ছে, ততই তিনি বিরক্ত হচ্ছেন। শেষপর্যন্ত তার হাতে কিছু গুঁজে দিয়ে একটা অসংবৃত মুহূর্তের ছবি নিলেন।

দেখলুম, আমাকেও লক্ষ্য করছেন তিনি। একটুখানি এদিক

সেদিক ঘুরেই আমার কাছে এলেন। জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আপনাকে বাঙালী মনে হচ্ছে, কী করেন এখানে ?

বললুম ঃ বসে থাকি।

ঐ মেয়েটিকে চেনেন ?

ভদ্রলোক জানতে চাইলেন।

চিনি বৈকি ঃ আমি জবাব দিলুম ঃ আমাদের মিল দেখছেন না ?

পকেট থেকে নোট বই বার করতে করতে ভদ্রলোক বললেন ঃ দেখছি বৈকি !

বলে খস খস করে কয়েক ছত্র লিখে ফেললেন।

আপনি ?

আমি প্রশ্ন করলুম তাঁকে।

গর্বিত ভাবে ভদ্রলোক তাঁর নাম বললেন। পরিচয় দিলেন একখানা বহুল প্রচারিত সাময়িক পত্রের নিয়মিত লেখক বলে। বললেন ঃ কাগজের কাজে জুনাগড়ে এসেছিলুম। হাতে চার পাঁচ দিন সময় আছে। তাই সৌরাষ্ট্র দেখে ফিরছি—সোমনাথ, পোরবন্দর, রাজকোট জামনগর দ্বারকা ওখা। সম্ভব হলে ভাবনগর পলিতানা। কচ্ছ দেখবার সময় বোধহয় হবে না।

যাবার আগে বলে গেলেন ঃ একটু নজর রাখবেন। দেশে ফিরেই সৌরাষ্ট্রের ভ্রমণ বৃত্তান্ত ছাড়ব।

নজর রেখেছিলুম। মাস পুরোবার আগেই তাঁর 'পশ্চিম সীমান্ত' শুরু হয়ে ছিল। পোরবন্দরের গল্প এল মাস কয়েক পরে। মহাত্মাজীর কথা নেই। আমার সঙ্গে ঐ খোঁড়া মেয়েটাকে জড়িয়ে একটা বীভৎস রসের কাহিনী লিখেছেন। ছবিটিও ছাপা হয়েছে পাশে।

আমি লজ্জা পাই নি। আমার লজ্জা কিসের ! জীবনের প্রতিবিম্ব পড়েছে সাহিত্যে। আমি তো সাহিত্যিক নই !

ছয়

ছোটমামার চেষ্টায় পোরবন্দরে চাকরি হল না, হল মাদ্রাজে তাঁরই পরামর্শে। বলেছিলেন: সাধু সেজে বসে থাকলে কিছু করতে পারবি না। সবাই যা করছে, তুইও কর। গান্ধীজীর নাম ভাঙালে জাত যাবে না।

কিন্তু আমার মন এ কাজে সায় দেয়নি। আমি তাঁর তিরস্কার মাথা পেতে নিয়েছিলুম।

তবু আমার ডাক এল দিল্লী থেকে। কর্তারা সেধে চাকরি দিলেন। বললেন: এধারে চাকরি নেই, দক্ষিণে কষ্ট হবে না তো?

আনন্দের চেয়ে আমার বিস্ময় হয়েছিল বেশি। পরে জেনেছিলুম, এ ছোটমামার কীর্তি। অভিনন্দন জানিয়ে লিখেছিলেন, জেল খাটলে আরও কিছু ভাল হত।

প্রথম প্রথম বড় অস্বস্তি বোধ করতুম। পেট চালাবার মতো ছোটখাট কাজ হলে নিজেকে এমন অপরাধী মনে হত না।

তারপর ধীরে ধীরে সব সহজ হয়ে গেল। ঘুরে ঘেরে চারিদিক দেখতে লাগলুম।

দক্ষিণে দেখবার জায়গার কি শেষ আছে? দেখে আশ মেটে না। কত রকম মানুষ, জাতও কত! সবাইকে কি মনে রাখতে পেরেছি! কিন্তু ভুলব না সেই মেয়েটাকে।

সেই মেয়েটা!

উটি থেকে ফেরার পথে সুভদ্রা আমার দৃষ্টি আকর্ষন করেছিল।

বললুম: কোথায় দেখেছি বলত?

চিনতে পারছ না: সুভদ্রা অনুযোগ করল: কী ভুলো মানুষগো তুমি!

সত্যি ভুলে গেছি। স্মরণ করতে পাচ্ছিনে। কিন্তু এত সহজে হার স্বীকার করব, সে পাত্র আমি নই। বললুম : ভুলেছি কে বললে! বলছি তো খুব চেনাচেনা ঠেকেছে।

সেকি গো, একে চেনাচেনা বলে?

সুভদ্রা বিস্ময় প্রকাশ করল গৃহিণীর মতো।

তবে?

তবে আবার কী! চেনা মেয়েকেও তুমি চেনাচেনা বলবে, তবু তোমার ভুলো মন নয় বলব!

এবারে আমি রাগের ভাণ করলুম, বললুম : অত ভণিতার কী দরকার! বলেই ফেলনা কোথায় দেখেছি মেয়েটাকে!

ঘরে তো আমরা সবই বলি, পই পই করে বলি। পথে বেরিয়েও বলতে হবে? ভেবেই দেখনা একটু।

সত্যি, মেয়েটাকে একবার দুবার নয়, বোধহয় অনেকবার অনেক জায়গায় দেখেছি। কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পাচ্ছিনে। চলতি ট্রেণের কামরায় জানালার দিকে মুখ করে বসেছে। নিঃশব্দে নির্বিকার চিত্তে। কথা কইছে না, চাইছেও না কোনদিকে। চোখের পলক পড়ছে কি পড়ছে না, এধারের বেঞ্চি থেকে তা দেখতে পাচ্ছিনা! মনে হচ্ছে, কোন পাথরের মূর্তি দেখছি। বললুম : বললেই বা। মনে যখন করতে পাচ্ছিনে, তখন ক্ষতি কি খবরটা দিলে।

উত্তরটা তবু সে এড়িয়ে গেল। বলল : পরের ভরসায় থেকে থেকেই তোমাদের স্বভাবটা নষ্ট হচ্ছে।

এবারে আর সন্দেহ রইল না। বুঝতে পারলুম যে সে নিজেও ভাবছে, কোথায় দেখেছে এই মেয়েটাকে। তারও মনে পড়ছে না কিছুতেই। ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই হেসে ফেললুম।

হাসলে যে?

সুভদ্রা রাগ করল।

হাসব না?

বলনা কোথায় মেয়েটাকে দেখেছি?

এবারে সে বিনা সর্তেই হার মানল।

আমি আরও ভাল করে মেয়েটাকে লক্ষ্য করলুম। এধার থেকে তার ডান দিকটা দেখতে পাচ্ছি। গায়ে জামা নেই কোনও, কিন্তু এমন পরিপাটি করে কাপড় জড়ানো যে তা চোখে পড়ে না। শাড়ির আঁচল বাঁ-কাঁধের উপর দিয়ে পিঠ জড়িয়ে ডান কাঁধের ওপর টেনে নিয়েছে। তার অনাবৃত কাঁধের একটুখানি দেখতে পাচ্ছি। সেখানে কালো উল্কি। গলায় পুঁথি আর পাথরের মালা, তার মাঝে মাঝে রূপোর টাকা। মাথার ঘন কালো চুল বেণীর মতো অনেক থোকায় পিঠ আর বুকের উপর ঝুলছে। রঙ কালো, মুখখানা দেখতে পাচ্ছিনা।

সুভদ্রা বলল ঃ মনে করতে পারছ না?

মনে করা কি সহজ ঃ আমি উত্তর দিলুম ঃ এই পাহাড়ে আর কটা দিন কাটালুম!

তা সত্যি।

কিন্তু আমি আশ্চর্য হই অন্য কথা ভেবে। এই সুভদ্রার সঙ্গেই বা আমার কদিনের পরিচয়! উটিতে আসবার আগে কি তাকে চিনতুম? না তার নামই শুনেছি কোনদিন! তবু এই পরিচয় এমন অন্তরঙ্গ হল কী করে! দক্ষিণের মেয়ে সুভদ্রা, আর আমার দেশ বাঙলা। তাদের ভাষাও ভাল করে আয়ত্ত হয়নি। কোনরকমে কাজ চালানো জ্ঞান। তবু তো আলাপ হল, নিবিড় হল পরিচয়!

সুভদ্রা আজ এমন করে কথা কইছে, যেন সে আমার চিরকালের চেনা। একসঙ্গে মানুষ হয়েছি, কিংবা ঘর করছি একসঙ্গে। আশ্চর্য হই তার আচরণে, তবু কেন যেন অশোভন মনে হয় না।

তার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিনটি আজও আমার মনে আছে। উটি দেখা শেষ হয়ে গেছে। এবারে বাহিরে যেতে হবে। মুকুর্টি পিকের গল্প শুনেছি অনেক। মাইসোর রোড ধরে সোজা উত্তরে যেতে

হবে ষোল মাইল। যেমন সুন্দর রাস্তা, তেমনই সুন্দর পাহাড়। সমুদ্রতল থেকে আট হাজার তিনশো আশি ফুট উঁচু, তবু তার মাথায় বেশি লোক ওঠেনি। নীলগিরির আদিবাসী টোডারা তাকে কৈলাসের মত পবিত্র ভাবে। তাই তারা ঘর বেঁধে আছে পাহাড়ের গায়ে। উপরে উঠবার পথের দুধারে তাদের অগণিত কুটীর। গরুর গাড়ির ছইএর মতো, কিন্তু খোলা নয় দু ধারে। মুরগির খোপে যেমন ছোট্ট দরজা, তেমনি একটুখানি দরজা এক পাশে। মেয়ে পুরুষ হামাগুড়ি দিয়ে ভিতরে ঢোকে। উটিতে পাহাড় কি কম? চারিদিকে পাহাড় ঘেরা উটি তো একখণ্ড মালভূমি। কত বিচিত্র নাম পাহাড়ের। ভূগোলে ডোডাবেট্টা পড়েছি। এখানে এসে আরও শুনলুম পাহাড়ের নাম—এল্‌ক হিল, স্নোডন, চার্চ হিল, ফার্ণ হিল, কার্ণ হিল, আরও কত। কিন্তু আমার মন টানল মুকুর্টি পিকের দিকে। বোধ হয় পাহাড়ের গায়ে আরও কিছু দেখতে পাব এই আশায়।

মাইশোর রোড দিয়ে মোটর চলে, বাসও চলে। উটি থেকে যারা মহিসুর যায়, কিংবা মহিসুর থেকে উটি, তারা ট্রেন ভালবাসে না। যায় মোটর কিংবা বাসে। পাহাড়ের উপর দিয়ে একশো মাইল রাস্তা। চোখে নেশা ঘনায়। মনে রঙ।

মোটরে করে আমি যখন মুকুর্টি পিকের নিচে পৌঁছলুম, আমার চোখেও নেশা ধরেছিল, আর মনে রঙ। সেই রঙ নিয়ে আমি সুভদ্রাকে দেখলুম। ডান হাতে একটা চামড়ার ব্যাগ আর বাম হাতে গোলাপী ছাতা। কাঁধের উপর থেকে ফিতে দিয়ে একটা কাপড়ের থলি ঝুলছে কোমরের কাছে। ময়লা রঙ, কিন্তু সুশ্রী চেহারা। মুখের হাসিতে বুঝি জাদু আছে। রাস্তার ধারের একটি গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়েছিল। আমায় নামতে দেখেই এগিয়ে এল। কথা কইল ইংরেজীতে: তুমি এই গাড়িতেই ফিরবে তো?

আশ্চর্য হলুম তার কথা কইবার সহজ ভাব দেখে। বললুম: হ্যাঁ।

এক গাল হেসে বলল : বাঁচা গেল। দাঁড়িয়ে থেকে হাঁপিয়ে পড়ছিলুম।

বলেই আমার গাড়ির দরজা খুলে তার ব্যাগ আর থলি নামিয়ে রাখল। বাম হাতের প্যারাসলও গুটিয়ে রাখল গাড়ির ভিতর। তারপর দরজা বন্ধ করে আমার দিকে ফিরে বলল : খুব আশ্চর্য হচ্ছ, না? এ কেমন বেহায়া মেয়ে!

আমি উত্তর দেবার আগেই বলল : তুমি কি চাও সারা রাত এখানে দাঁড়িয়ে থাকি? কিংবা ঐ কুঁড়ের ভেতর রাত কাটাই? নিশ্চয়ই চাও না। কাজেই তোমার মনের যখন সমর্থন আছে, তখন মুখের অনুমতির আর কী দরকার!

যুক্তি ভাল সন্দেহ নেই, কিন্তু এমন আচরণ কি স্বাভাবিক! আমার অনেক প্রশ্ন ছিল জানবার—কেন এসেছে, কী করে এসেছে, আমি না এলে ফেরার কী ব্যবস্থা হত—এই সব। কিন্তু তার মুখের দিকে চেয়ে কিছুই জিজ্ঞাসা করতে পারলুম না। বললুম : বেশতো, এক সঙ্গেই ফেরা যাবে।

আমার উত্তর শুনে সুভদ্রা হাসল, বলল : এমন বেহায়া মেয়েকে আর কী বলবে বল।

গাড়িতে বসে সে তার নাম বলেছিল সুভদ্রা।

বেশ নাম তো!

আমি উত্তর দিয়েছিলুম।

সুভদ্রা হেসে বলেছিল : নামের জন্য প্রশংসা আমার নয়। আমার বাপ-মায়েরও নয়। ধন্যবাদ দিতে হয়, ব্যাসদেবকে দাও।

বললুম : ব্যাসদেব আধুনিক ছিলেন সন্দেহ নেই।

সুভদ্রা প্রতিবাদ করল, বলল : আমাদের লেখকদের মতো আধুনিক নন।

সেদিন মোটরে বসে ভেবেছিলুম, সুভদ্রার নামে একটা গল্প

লিখব। সেই হবে আমার 'সেই মেয়েটা'। কিন্তু আজ ট্রেণের কামরায় সুভদ্রা গণ্ডগোল বাধাল। বলল : সেই মেয়েটা।

সত্যিই তো, এ আর একটা মেয়ে। একেও যেন কোথাও দেখেছি। দেখেছে সুভদ্রাও। কিন্তু কেউই মনে করতে পারছিনে, কোথায় দেখেছি একে।

দেখেছি কি মুকুটি পিকের টোডা বস্তিতে? বেশে-বাশে তাকে টোডাই তো মনে হচ্ছে। হাবভাব দেহের গড়নও যেন টোডাদের মতো। ভয়ে ভয়ে সুভদ্রাকে এই সন্দেহের কথা বললুম।

হেসে সুভদ্রা গড়িয়ে পড়ল। উদ্দাম অফুরন্ত হাসি, কিছুতেই আর থামতে চায় না। সেই মেয়েটাও ফিরে ফিরে দেখতে লাগল।

অত হাসি কিসের?

আমি তাড়া দিলুম।

একটু সামলে নিয়ে সুভদ্রা বলল : দেখতো ভাল করে চেয়ে, মেয়ে না ছেলে?

আমি প্রতিবাদ করলুম। ধমকের সুরে বললুম : তামাসা হচ্ছে?

তোমার কথা যে ঐ রকমই হয়েছিল : উত্তর দিল সুভদ্রা : এতক্ষণ দেখে শুনে ভেবে চিন্তে বললে, বোধ হয় টোডা মেয়ে!

হার মানতে আমি রাজী হলুম না, বললুম : ব্যাপারটা তোমার কাছে সহজ মনে হতে পারে, আমার কাছে নয়। আমি বাঙলা দেশের ছেলে। আমি তোমাদের দক্ষিণী বলে জানি, তার বেশি আমায় জিজ্ঞেস ক'রো না।

সুভদ্রা এ কথার উত্তর দিল না। শান্ত হয়ে বলল : কোথায় দেখেছি এবারে বল।

রাগত ভাবে আমি জবাব দিলুম : মুকুটি পাহাড়ে।

তবে পাহাড় ছেড়ে ট্রেণে উঠবে কেন?

তার আমি কী জানি?

ইস্! এখনও রেগে আছ দেখছি! নাও একটা লজেন্স খাও।

বলে তার চামড়ার ব্যাগ খুলে গোটা কয়েক লজেন্স এগিয়ে দিল।

রাগে গা জ্বলে যায়। তবু কেন যেন ভাল লাগে। হেসে হাত বাড়িয়ে দিলুম, বললুম: দাও।

সুভদ্রা নিজেও একটা লজেন্স খেল। তারপর আমার কাছে এল ঘনিয়ে। আমি সরে বসতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু সুভদ্রা বাধা দিল। চুপি চুপি বলল: আমার কি মনে হয় জানো? মেয়েটা পালাচ্ছে।

তাই নাকি?

আমি চমকে উঠলুম।

দেখছ না ঐ গলার মালাটা: সুভদ্রা আঙুল দিয়ে দেখাল: ওটা ওর বিয়ের মালা, ঐ মালা দিয়েই তো ওর বিয়ে হয়েছিল।

আমার মুখের দিকে চেয়ে বলল: তুমি বুঝি এদের বিয়ের ব্যাপার জান না?

কী করে জানব?

তাও তো বটে! তাহলে গোড়া থেকেই বলি, কী বল!

বলে বেঞ্চির উপর পা তুলে আমার দিকে ফিরে বসল।

সুভদ্রা ভুলে গেছে যে মুকুর্টি পিকের উপর টোডাদের বস্তি দেখাবার সময় এ গল্প সে আমায় বলেছে। টোডাদের বিয়েটা যেমন সরল, বিবাহিত জীবনটা তেমন নয়। বিয়ের বর হাসতে হাসতে কনের গলায় একখানা মালা পরিয়ে দিলেই বিয়ে হয় সত্যি, সমাজও মেনে নেয় ভোজ খাবার পর। কিন্তু তারপর মেয়েদের যে জীবন, তা বলবার সময় সুভদ্রার চোখও ছলছল করে উঠেছিল। একটা মেয়ে একটা পুরুষকে কখনও স্বামী বলে পায় না। তার উপর পরিবারের সব ভাইদের সমান অধিকার। কখনও সেই মেয়ের স্বামীরা থাকে বিভিন্ন গ্রামে। তখন তাকে ঘর করতে হয় পালা করে।

ছেলের বাপ স্থির করবারও একটা নির্দিষ্ট রীতি আছে। স্বামীরা মিলিত হয়ে নিজেরাই স্থির করে নেয়। তারপর সেই কথা জানাবার জন্য একটা বন্য অনুষ্ঠান। এই কথা বলবার সময় সুভদ্রার লজ্জা

দেখেছি যত, তার চেয়ে বেশি ছিল তার আগ্রহ। মনে হয়, আমি আরও কিছু দেখেছি। সে তার বেদনা। এই সব অসহায় মেয়ের জন্য এক রকমের অদ্ভুত সমবেদনা। সুভদ্রাকে তখন আমার ভাল লেগেছিল।

আমিও পা মুড়ে তার দিকে ফিরে বসলুম।

সুভদ্রার হঠাৎ কি যেন মনে পড়ে গেল। বলল ঃ তুমি তো লোক সুবিধের নও।

কেন বলতো ?

বারে বারে এক কথা শুনতে চাও আমার কাছে !

বলে দৃষ্টি দিয়ে তার ভর্ৎসনা জানাল।

আমি উপভোগ করলুম এই অভিযোগটুকু।

সুভদ্রা বলল ঃ এমন সমাজ কেন হল জান ?

উত্তর নিজেই দিল, বলল ঃ অভাবে। একদিন এরা শিশুকন্যা হত্যা করেছে অভাবের তাড়নায়। আজ একটি কন্যাকে চাই একটা গোটা পরিবারের জন্যে। প্রয়োজন হলে কয়েকটা পরিবারের জন্যে।

সুভদ্রার একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

কী আশ্চর্য !

তুমি আশ্চর্য বলছ ঃ সুভদ্রা আপত্তি জানাল, বলল ঃ কী জীবন বল !

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে বললুম ঃ এই জন্যই কি মেয়েটা পালিয়ে যাচ্ছে মনে কর ?

কে জানে ! হয়তো বা আর একটা স্বামীর কাছে যাচ্ছে, কেট্টি কিংবা আরাভাঙ্কাড়ুতে।

এমনি একা একা যায় ? স্বামী এসে নিয়ে যায় না ?

কত আর আসবে ! গরিব মানুষ তো, কত রেল-ভাড়া জোগাবে বল !

তা বটে।

আমি নিজের দিকে তাকালুম, নিজের চারপাশে। রেলের তৃতীয় শ্রেণীর কামরা। যত ভিড় হবে মনে করেছিলুম, তত হয়নি। নীলগিরির এই ছোট গাড়িতে বুঝি বেশি ভিড় হয় না। একটু ফাঁকা ফাঁকা। হাত পা ছড়াবার জায়গা আছে। আছে আস্তে আস্তে গল্প করবার সুযোগ। সুভদ্রা ঠিকই বলেছিল, দিনের গাড়িতে বেশি পয়সা দিলে শুধু শুধুই পয়সা নষ্ট।

আমি হয়তো আরও কয়েকটা দিন উটিতে থাকতুম, কিন্তু সুভদ্রার জন্যই থাকা হল না। বলল : চল না একসঙ্গে ফিরি।

ভারি জ্বালা তো। এইতো সেদিন এলুম।

সেদিন কিগো, সে তো অনেকদিন হল। দুদিনে কি এমন ভাব হয়!

দুদিনে যে ভাব হয় না, সে আমি জানি। আর জানি বলেই তো নিজের কাছে সব কিছু আশ্চর্য ঠেকছে।

সুভদ্রা তাড়া দিল : উত্তর দিচ্ছনা যে?

বললুম : উত্তর আর কী দেব! সত্য কথাকেও তুমি মিথ্যে বলে প্রমাণ করে দিচ্ছ। তোমার সঙ্গে বৃথা তর্ক।

সুভদ্রা হাসল। কিন্তু আমি তার হাসির অর্থ জানি। এই হাসি দিয়েই তো সে আমায় জাদু করেছে।

সুভদ্রা বলল : আমাদের পরিচয় শুধু দুদিনের, এই কথাই বলবে তো! তার উত্তর আছে আমার কাছে।

আমি তার মুখের দিকে তাকালুম।

সুভদ্রা বলল : তোমার দিন হল দেবতাদের মতো।

বলে হেসে যেন গড়িয়ে পড়ল।

উটিতে মেয়েটা কোথায় উঠেছিল তা বলেনি। তাকে এগিয়ে দেবার সুযোগও দেয়নি কোনদিন। রাস্তার উপর আমি অদৃশ্য না হলে সে কিছুতেই বাড়ির দিকে পা বাড়াত না। প্রথম দিনই এটা বুঝতে পেরেছিলুম। মাইসোর রোড ধরে যখন উটিতে ঢুকলুম, বললুম : কোথায় পৌঁছে দেব?

পৌঁছে দেবে ?

মেয়েটা হাসল অনেকক্ষণ ধরে, বলল ঃ অত আদর আমার সইবে না। তার চেয়ে বল কোথায় নামিয়ে দেবে।

বললুম ঃ একটা কিছু বল।

যদি কিছু নাই বলি, কিংবা বলি তোমার সঙ্গে থাকব তোমার হোটেলে। তুমি নিশ্চয়ই হোটেলে থাক ?

বেশ তো, আমার হোটেলেই চল।

হয়েছে তাহলে !

বলে সুভদ্রা হাসতে লাগল।

চেরিং ক্রশ পেরবার সময় হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল ঃ দাঁড়াও এইখানে।

হকচকিয়ে ড্রাইভার থেমে পড়ল। আমি বললুম ঃ কী হল ?

হাসল সুভদ্রা, বলল ঃ আমি নামব।

আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললুম।

জিনিসপত্তর গুটিয়ে নিয়ে সুভদ্রা নামল, বলল ঃ কাল আবার দেখা হবে তো ? ঠিক এইখানে ?

জানিনা কেন বলে ফেললুম ঃ হবে।

কখন হবে তা জানবার দরকার নেই ! আমি কি সারাদিন বসে থাকব তোমার জন্যে !

তা বটে !

বিকেল ঠিক চারটেয়, কেমন ?

বলেই হাত নেড়ে দিল।

চলতি গাড়ি থেকে আমি পিছন ফিরে দেখেছিলুম, যতক্ষণ দেখা গেল, সুভদ্রা একই জায়গায় দাঁড়িয়েছিল।

রাতে অনেকক্ষণ ধরে আমি এই আশ্চর্য মেয়েটার কথা ভাবলুম। ঠিক এমন মেয়ে আমি বোধ হয় আগে কখনও দেখিনি। কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না যে মেয়েটার সঙ্গে আজই আমার প্রথম পরিচয়।

পরিচয় কি এমনি করে হয়? জানা নেই শুনো নেই, নেই কোন যোগসূত্র। চলতে চলতে পথের উপর দেখা হল, আর অমনি পরিচয়। শুধুই কি পরিচয়! মনে হল, যেন কত কালের চেনা আমরা। যেন রোজই দেখা হচ্ছে এখানে সেখানে। ভূমিকার দরকার হল না, প্রয়োজন হল না সৌজন্য বিনিময়ের। সরাসরি এগিয়ে গেলুম! আশ্চর্য লাগল। ভাবলুম, এই মেয়েটাকে নিয়েই একটা গল্প লিখব। সুভদ্রাই হবে আমার 'সেই মেয়েটা'।

কিন্তু আজ ট্রেণের কামরার ভিতর সুভদ্রা নিজেই গণ্ডগোল বাধাল। বলল: দেখছ, সেই মেয়েটা!

এ তো আর একটা মেয়ে! কিন্তু মনে হল, একেও তো দেখেছি! দেখেছে সুভদ্রাও। নইলে বলবে কেন 'সেই মেয়েটা'!

হঠাৎ মনে পড়ে গেল। বললুম: মনে পড়েছে।

কিন্তু কী মনে পড়েছে সুভদ্রা তা জিজ্ঞাসা করল না। আমি নিজেই বললুম: উটির টোডা বস্তিতে দেখেছি এই মেয়েটাকে।

ঠিক দেখেছ!

সুভদ্রা উত্তর দিল। কিন্তু তার ঠোঁটের উপর যেন বিদ্রূপের ইঙ্গিত পেলুম।

কেন, বিশ্বাস হল না?

আমি জানতে চাইলুম।

সুভদ্রা সে কথার উত্তর দিল না। বলল: এরা কত গরিব জান?

আমি তার গলার স্বর শুনে চমকে উঠলুম! বড় গম্ভীর তার স্বর। বর্ষার নূতন মেঘের মতো থমথমে। আমি তার চোখের দিকে তাকালুম। চোখে পলক নেই, দু চোখের পাতা জলে ভেজার মতো আড়ষ্ট হয়ে আছে। সুভদ্রা নিজেই নিজের প্রশ্নের উত্তর দিল, বলল: কয়েকটা গরু মোষ নিয়ে বেঁচে আছে। বেঁচে ঠিক নেই, যুদ্ধ করছে বাঁচবার জন্যে।

একটু থেমে বলল: পশু পালন করে জীবন ধারণের যুগ যে অনেকদিন আগেই শেষ হয়ে গেছে, তাও এরা জানে না। জানলে সংসারের ভার কমাবার জন্যে শিশু কন্যা জন্মাতেই তার গলা টিপে মারত না।

আমি শুনেছিলুম যে সতীদাহ নিবারণের মতো সরকার আইন করে এই হত্যাও বন্ধ করেছেন। তাই চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করলুম: এখনও মারে?

সুভদ্রা এ কথার উত্তর দিল না। বলল: জীবনের আস্বাদ এরা কোনদিনই পায়নি, তাই এরা বেঁচে আছে। সে ধারণা জন্মালে অনেকদিন আগেই মরে যেত।

আমি স্পষ্ট দেখলুম, সুভদ্রার দৃষ্টি একেবারে ঝাপ্‌সা হয়ে গেছে। উল্টোদিকে মুখ ফিরিয়ে আমার নজর এড়াবার চেষ্টা করল।

গাড়ির আর একটা কোণায় কয়েকজন লোক কথা কইছিল। কিন্তু তবু সমস্ত গাড়িটা আমার নিস্তব্ধ মনে হল। ট্রেণের যেন শব্দ নেই, বাহিরে যেন পাহাড় নেই, পৃথিবী নেই। নিজেকেও বুঝি ভুলে গেলুম। মনে হল, পৃথিবীতে শুধু একটি মানুষ আছে। সেই মেয়েটা। সুভদ্রাকে দেখতে পেলুম না, ওধারের মেয়েটিকেও না। শুধু মাত্র একটি মুহূর্ত! তারপরেই দেখলুম, ওধারের মেয়েটি তাকিয়ে আছে জানালার বাহিরে মুখ ফিরিয়ে, আর সুভদ্রা আছে আমারই পাশে। তার মুখও আমি দেখতে পাচ্ছি না। আমার কিছু বলবার আছে?

অনেকক্ষণ পরে সুভদ্রা কথা কইল, বলল: তোমার কিছু বলার নেই?

আমি তো নিজেকেই এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছি। কী জবাব দেব সুভদ্রাকে।

আমরা সভ্য মানুষ: সুভদ্রা আবার কথা কইল: সভ্যতার গর্ব করি আমরা। কিন্তু তুমিই বল, আমাদের সভ্যতা কি সূর্যের

আলোর মতন? না, তেলের প্রদীপ? নিজের ঘরের কোণাটাই ভাল করে আলো হচ্ছে না।

সুভদ্রা আবার সোজা হয়ে বসেছে। এখন আমি তার মুখ দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু কী আশ্চর্য! এ তার কোন্ রূপ? এমন রূপ তো আমি তার দেখিনি। তার দৃষ্টিতে কি আগুন লেগেছে?

সুভদ্রার চোখে এই আগুন আমি আর একদিন দেখেছিলুম। মেয়েটার বুকের ভিতর বোধ হয় আগুন আছে। বুকের আগুন তো দেখা যায় না। যখন জ্বলে ওঠে, তখনই দেখি দু চোখের দৃষ্টিতে। কিন্তু কিসে এই আগুন লাগল!

সেদিনও এই কথা জানতে চেষ্টা করেছিলুম। প্রতিদিনের অভ্যাস মতো চেরিং ক্রশের কাছাকাছি আসতেই সুভদ্রা এগিয়ে এল। এই নিয়মই হয়েছে। আমরা রোজ এখানকার ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডের কাছে মিলিত হব, এইখান থেকেই বিদায় নেব। এখানে আসবার সময় বলে দেয় সুভদ্রা নিজে। কিন্তু রোজই এসে দেখি, সে আগে ভাগেই এসে আমার অপেক্ষা করছে। আমার ইচ্ছে ছিল দেখবার সে কোন্ দিক থেকে আসে। যাবার বেলাতেও সে সুযোগ সে দেয় না। আমি অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত সে সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে। একদিন আমি জানতে চাইলুম: কেন এমন কর?

কী করি বলত।

সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বললুম: তোমাকে যদি তোমার বাড়ির দরজায় পৌঁছে দিই, কী আপত্তি তাতে? ভয়ই বা কিসের? বাধা থাকে, বাড়ির ভেতর না হয় নাই ঢুকলুম।

উত্তরে সুভদ্রা শুধু হাসে।

হেসে উড়িয়ে দিওনা সুভদ্রা: আমি তাকে আদেশের সুরে বলি: আমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলো না।

তবে কী খেলব?

কোন পরিবর্তন নেই সুভদ্রার। দুচোখ ভরা কৌতুক শুধু ঝলকে উঠছে!

বললুম: আমি তোমার সঙ্গে যেচে ভাব করতে আসিনি। তুমি নিজেই এগিয়ে এসেছ। সেই কথা তোমায় মনে রাখতে হবে।

বোটানিকল গার্ডেনের দিকে যেতে যেতে এই কথা হচ্ছিল। সুভদ্রা বলল: যেচে ভাব করতে আসি, কে তোমায় বলল? একদিন উপকার করেছিলে, তার জন্যে কৃতজ্ঞতা জানাতে আসি।

কৃতজ্ঞতা, আমি একটা ভেংচি কাটলুম: রোজ আস কৃতজ্ঞতা জানাতে!

সুভদ্রা হেসে বলল: আর আসি সময় কাটাতে! বাড়িতে সময় কাটে না, বেড়াতেও ভাল লাগে না একা একা।

সেই জন্যেই তো বলছি, বাড়ি থেকে তোমায় তুলে আনব, আবার পৌঁছে দেব বাড়িতে।

অত আদর আমার সইবে কি?

হাসতে লাগল সুভদ্রা।

এই হাসিতে যে চাপা আগুন আছে, তখন দেখিনি। দেখেছিলুম পরে যখন বোটানিকল গার্ডেনে বসে আমরা নিজেদের কথা বলছিলুম।

এক ফালি রোদ পড়েছিল সুভদ্রার পায়ের উপর, মুখের উপরেও একটু বেশি আলো। ছোট ছোট ফুলের চারা কাঁপিয়ে শিরশিরে হাওয়া বইল একটুখানি। সুভদ্রার কপালের চুল একটু এলোমেলো হল।

বললুম: নিজেদের পরিচয় কি আমরা গোপন রেখেই চলব?

সুভদ্রা উত্তর দিল না।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে বললুম: উত্তর দিচ্ছ না যে?

সব কথার কি উত্তর দেওয়া যায়?

বললুম : তুমি কি আমাদের পরিচয়ের পালা এখানেই শেষ করে যেতে চাও ?

এ পালা একদিন সাঙ্গ হবেই : সুভদ্রা উত্তর দিল : তার জন্যে তাড়া কিসের ?

তখনও সুভদ্রার মুখে আমি কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করিনি। বললুম : সাঙ্গ হবে ? কেন হবে ?

সুভদ্রা উত্তর দিল না। কিন্তু আমার মনে হল, তার বুকের ভিতর আগুন ধরে উঠল। উত্তরটা চেপে যাবার জন্য সে প্রাণপণ চেষ্টা করছে। একটুখানি অপেক্ষা করে বললুম : কেন আমরা সাঙ্গ হতে দেব ?

এবারে সুভদ্রার দৃষ্টি দেখে আমি ভয় পেলুম। উত্তরের জন্য আর আমি জোর করতে পারলুম না।

আজও গাড়ির ভিতর এই দৃষ্টি দেখলুম সুভদ্রার। কিন্তু তার জ্বালা কোথায় ? আমাকে সে কি তার মনের কথা বলবে না ?

ছোট লাইনের ছোট ট্রেণ। পাহাড় বেয়ে গড়িয়ে নামছে। আমার চোখের সামনে এখন অন্য কিছু নেই। শুধু পাহাড়। আর পাশে সুভদ্রা। এক সময় পাহাড় শেষ হয়ে ট্রেন সমতলে পৌঁছবে। তখনও কি সুভদ্রা আমার পাশে থাকবে ?

হঠাৎ কেন যেন অসহায় মনে হল নিজেকে। বললুম : তোমার উটির ঠিকানা আমায় জানতে দিলে না। মাদ্রাজের ঠিকানাটা তুমি দেবে তো ? না সেখানেও আমায় অপেক্ষা করতে হবে ট্রিপ্লিকেনের সমুদ্র বেলায় ?

কথাটা শুনতে পেলে সুভদ্রা নিশ্চয়ই হাসত। কিংবা শুনতে পেলেও মন দেয়নি আমার কথায়। বললুম : কথা কইছ না যে ?

সুভদ্রা হঠাৎ তার সম্বিৎ ফিরে পেল। বলল : কিছু জানতে চাইছ ?

হেসে বললুম ঃ জিজ্ঞেস করছি, মাদ্রাজে কোথায় তোমার অপেক্ষা করব ?

কী দরকার তার ?

বললুম ঃ দরকার মনে করলেই দরকার।

তারপরেই জিজ্ঞাসা করলুম ঃ আমাদের এই সম্পর্কটুকু তুমি কি অস্বীকার করবে ?

ট্রেণ একটা ষ্টেশনে দাঁড়িয়েছিল। আবার চলতে সুরু করতেই সুভদ্রা বলল ঃ দেখলে কাণ্ড। আরাভাঙ্কাড়ুতেও মেয়েটা নামল না। ফার্ণ হিল গেল, নভডেল গেল, কেট্টী গেল, গেল আরাভাঙ্কাড়ুও! ওয়েলিংটন কিংবা কুন্নুরে কি নামবে ? মনে হচ্ছে আমাদের সঙ্গেই চলল মেয়েটা।

বুঝতে পারি, আমার প্রশ্নের উত্তর সে দেবে না। না দিলেও কিছু বলবার নেই ! কী অভিযোগ করব ! কার কাছে করব ? অভিযোগের আছেই বা কী !

তারপরেই অন্য কথা মনে এল ! সম্পর্ক যদি কোন নাই রাখে সুভদ্রা, তো এমন করে এতদিন কাছে টানবে কেন ? এ সবই কি ছল, সবই ছলনা ?

পাশে চেয়ে দেখলুম, সুভদ্রা হাসছে মিষ্টি মিষ্টি করে।

বললুম ঃ হাসছ কেন ?

ভয় পাচ্ছি বলে।

ভয় কিসের ?

ভয় নেই ! মেয়েটা যদি আমাদের সঙ্গেই যায় শেষ পর্যন্ত, তা হলে কী হবে ?

বুঝতে পারি, সুভদ্রা আমার সঙ্গে তামাসা করছে। বললুম ঃ তাতে ভয়ের কী আছে ! সব দিকেই তো মিল দেখতে পাচ্ছি, তোমার সঙ্গেই থাকবে !

সুভদ্রা কি শিহরে উঠল ? আমি যখন ফিরে তাকালুম,

নিজেকে সে তখন সামলে নিয়েছে। বলল: তুমি ওর ভার নাও না!

তুমি নিজের ভার যদি দাও, তাহলে ওর ভারও নেওয়া হবে।

একটু থেমে বললুম: দেবে?

পরম কৌতুকে সুভদ্রার সারা মুখ হল উজ্জ্বল। কিন্তু উত্তর দিল না।

আমার আর একটু কাজের কথা ছিল। মেট্টুপালায়মে আমরা গাড়ি বদল করব। ছোট লাইনের গাড়ি ছেড়ে উঠব বড় লাইনের ট্রেণে। সারারাত চলে সকাল বেলায় পৌঁছব মাদ্রাজ। প্রথম শ্রেণীতে আমার বার্থ রিজার্ভ করা আছে। একসঙ্গে যেতে সুভদ্রা কিছুতেই রাজী হয়নি। বলেছিল: শৌখিনতা।

আমি বলেছিলুম: শৌখিনতা তো তুমি করছ না, করছি আমি। আমি তোমার টিকিট কাটব।

সুভদ্রা বলল: পয়সা বেশি হয়ে থাকলে কোনও দুঃস্থ পরিবারকে দাও। এ ভাবে নষ্ট করো না।

একে তুমি পয়সা নষ্ট বল?

নষ্ট নয়: উত্তর দিল সুভদ্রা: শুধু একটা রাতের একটুখানি আরাম। একটা রাত না হয় বসেই কাটালাম। আর বসেই যে কাটাতে হবে, তারই বা কী মানে আছে। শোবার জায়গাও তো পেতে পারি!

এ যুক্তি আমার ভাল লাগল না। বুঝতে পেরে সুভদ্রা বলল: মাদ্রাজে নেমেই তো পরস্পরকে দেখতে পাব।

এ কথা বলবার সময় সুভদ্রা হেসেছিল। কিন্তু আমি হাসতে পারিনি।

মাদ্রাজে নেমেও পারিনি হাসতে। ভীড়ের ভিতর তাকে আর খুঁজে পাইনি। মেট্টুপালায়ামে আমি তাকে সেই মেয়েটাকে সাহায্য করতে দেখেছি। মাদ্রাজে নেমে আর কাউকেই দেখিনি। গাড়ির

এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত অনেকবার খুঁজলুম। তাড়াতাড়ি গেটের কাছে গিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়ালুম। সুভদ্রাকে আর দেখতে পেলুম না।

মাদ্রাজের সমুদ্রবেলায় বেড়াতে বেড়াতে ভাবি, এইতো জীবন! বিদেশে চাকরি করতে এসেছি। ছুটিতে বেড়াতে গিয়ে মধুর আস্বাদ যদি খানিকটা পেয়েই থাকি তো সে আমার উপরি লাভ। তার জন্য ক্ষোভ কিসের! বাঙলা দেশের ছোট গল্পে এমন কাহিনী তো হামেশাই পড়ি, আমার জীবনেও না হয় এমন একটি ঘটনা অকস্মাৎ ঘটে গেল। হারানোর বেদনা কেন জীবনকে তিক্ত করবে! পাওয়ার আনন্দটুকু জমা থাক স্মৃতির ভাণ্ডারে।

কিন্তু সেদিন হঠাৎ চমকে উঠলুম। ট্রিপ্লিকেনের সমুদ্রতটে কয়েকটি মেয়েকে দেখলুম। বালির উপরে বসে হাসি গল্পে উদ্দাম হয়ে উঠেছে। রঙিন রেশমি শাড়ি পরা মেয়েগুলি। কালো রঙ, কিন্তু ঝক ঝক করছে সাদা দাঁত। মাথার ঘন কালো চুল বেণীর মতো অনেক থোকায় পিঠের উপর ঝুলছে, দুলছে। সেই মেয়েটা নয়?

সেই মেয়েটাই তো? কিন্তু এমন পরিবর্তন হয়েছে এই কমাসের ভিতর।

সুভদ্রা কোথায়? সেও কি আছে এই মেয়েদের দলে?

আমি কাছে গেলুম, কিন্তু সুভদ্রাকে দেখতে পেলুম না।

সেই মেয়েটা আমায় চিনতে পেরেছিল। ফিক করে হাসল আমায় দেখে।

বললুমঃ সুভদ্রা কোথায়?

মেয়েটা অনেকক্ষণ আমার দিকে চেয়ে রইল, তারপরেই হেসে গড়িয়ে পড়ল। সুভদ্রাও এমনই করে হাসত। এই মুহূর্তে তাকে সুভদ্রা বলেই যে ভ্রম হচ্ছে।

সাত

আর এক ছুটির গল্প।

পথের টানেই পথে বেরিয়েছিলুম। কিন্তু এ কি পথ!

একটা ঘন ঝোপের উপরেই বসে পড়ল সেই বুড়ো যাত্রীটি। রাস্তার উপরে বসলে সে পথে যে আর কেউ যেতে পারবে না।

পিছনের যাত্রীটিও দাঁড়াল। বোধহয় আশ্চর্য হয়ে ভাবল ঐ বুড়োর কথাটা। সে তো বুড়ো নয় তার মতো, সে যুবক। কিন্তু কী করে তার মনের কথাটি জানল।

এমনই বোধহয় আরও অনেকে ভাবল। অনেকে কেন, সবাই।

একটু দম নিয়ে বুড়ো বলল: পূর্বঘাট পাহাড়টাই তাহলে পথ।

মিথ্যা নয়। যে কোন জায়গা দিয়ে চলতে শুরু করলেই এমনই পথ হয়।

আমি এগিয়ে গিয়েছিলুম। বুড়োর কথা শুনে আমিও দাঁড়ালুম। আমার কেন এ দুর্মতি হল! আমি তো পুণ্যলোভী যাত্রী নই! আমি বেরিয়েছি ভ্রমণে। বেড়াতে ভাল লাগে তাই। কিন্তু এ কেমন ভাল লাগা! এর চেয়ে যে মৃত্যু ভাল ছিল। ভাগ্যকে ভর্ৎসনা করেও আজ আর সান্ত্বনা পাচ্ছিনা।

এমনই বোধহয় হয়। সব মানুষেরই হয়। সুস্থ মাথাও খারাপ হয় মাঝে মাঝে, ভূত চাপে ঘাড়ের উপর। তা না হলে এ পথে আসবে কেন! মাথা খারাপ না হলে এ পথে কেউ আসে!

বেরিয়েছিলুম দক্ষিণ ভারত দেখতে। নির্বিঘ্নে এলুম বিজয়ওয়াড়া পর্যন্ত। কণকদুর্গার মন্দির প্রাঙ্গণে আমার কপাল পুড়ল। কতো সিঁড়ি ভেঙ্গেছিলুম মনে নেই, এইটুকু মনে আছে যে মন্দির পৌঁছতে

বুকের দম সব ফুরিয়ে গিয়েছিল। মাটিতেই বসে পড়ছিলুম। পিছন থেকে রাজাগোপালন ধরে ফেলল।

হ্যাঁ, রাজাগোপালন তার নাম, পরে সে কথা জেনেছিলুম। বলল : দেখ।

দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। ক্লান্তি ভুলে গেলুম। মনে হল, এমন দৃশ্য আগে কখনও দেখিনি। মুখে কথা এল না, নিঃশব্দে চেয়ে রইলুম।

কেমন দেখছ ?

জানতে চাইল রাজাগোপালন।

মনে হল, তারায় ভরা আকাশ দেখতে পাচ্ছি নিচে। আকাশটা যেন উল্টে গেছে, কাছে এসেছে, একেবারে ধরা ছোঁয়ার ভিতর। উত্তর না দিয়ে আমি উপরের দিকে তাকালুম।

রাজাগোপালন বলল : ওই হল বিজয় ওয়াডা শহর। বিদ্যুতের আলোয় রোজই এমন দেখায়।

একটু থেমে বলল : উত্তর থেকে আসছ, তাই না।

মাথা নেড়ে সে কথা স্বীকার করলুম।

রাজা গোপালন বলল : নিচে থেকে কনক দুর্গার মন্দির তাহলে দেখতে পাওনি। দক্ষিণে যাবার সময় পাবে। কৃষ্ণার পুলের ওপর থেকে। সে দৃশ্য আরও মনোরম। ট্রেনে উঠে মনে রেখো।

এই রাজাগোপালনের পরামর্শে এসেছি এই পথে। সেই আমায় সর্বনাশের পথে আনল। বলল : হিন্দুর তীর্থ সবই এই রকম। যত দুর্গম, তত মনোরম। হিমালয়ের ওপরে সব তীর্থের কথা ভাব।

ভ্রমণ কাহিনীতে সেই সব তীর্থের কথা আমি পড়েছি। ভয়ে শিহরে উঠি।

রাজাগোপালন বলল : দক্ষিণেও আছে অমন সুন্দর তীর্থ।

হঠাৎ কী ভেবে ব্যস্ত হয়ে উঠল। বলল : মল্লিকার্জুন যাবে ? মহাদেবের সেখানে জ্যোতির্লিঙ্গ। দুর্গম পথ, কিন্তু আনন্দ অপার।

মনে মনে ভ্রমণের একটা ছক কেটেছিলুম। কিন্তু কী মোহে তা পাল্‌টে ফেললুম। এখন নিজের কাছেই আশ্চর্য লাগছে। রাজা গোপালন শুধু সমবয়সী নয়, সঙ্গীও ভাল। অল্পক্ষণের আলাপেই তা টের পেয়েছিলুম। বলল : তোমাকে সঙ্গে পেলে আমিও যাই।

বললুম : তীর্থ করতে ?

রাজাগোপালন হাসল, বলল : তীর্থযাত্রী এ দেশে সবাই। তারজন্যে তোমাকে ডাকব কেন ! আমি যে তোমার মতো যাত্রী।

পাহাড় থেকে নেমে স্টেশনে ফিরতে দিলনা, তার বাড়িতে এনে তুলল। সরকারী কর্মচারী সে। একদিন সময় নিল ছুটির ব্যবস্থা করতে। তারপরদিনই ছোট লাইনের গাড়িতে চাপলুম।

আমার সঙ্গে ভ্রমণ কাহিনীর বই ছিল। তাতে এই তীর্থের উল্লেখ আছে। ভিনুকোনডা থেকে সত্তর মাইল ও মার্কাপুর রোড থেকে পঞ্চাশ মাইল পথ। শুনে রাজাগোপালন হাসল। বলল : তাহলেই হয়েচে।

আমরা এলুম নাণ্ডিয়ালের পথে। বত্রিশ মাইল বাসে ঠেঙিয়ে আত্মাকুর। সেখান থেকে পেদ্দাচেরুভু ছাব্বিশ মাইল, মোটরে এলুম। শুধু দশ মাইল পথ পায়ে হাঁটছি। কিন্তু সেই দশ মাইলই যেন ফুরোয় না।

রাজাগোপালনের উৎসাহ বেশি। অনেকখানি পথ সে এগিয়ে গেছে। আমাকে দাঁড়াতে দেখে চেঁচিয়ে ডাকল। সত্যিই তো, ভাগ্যকে ধিক্কার দিলে এই পথ তো ফুরবে না ! আবার এগোলুম।

রাজাগোপালন আমার অপেক্ষা করছিল। কাছে আসতে বাঁ-হাতে আর একটা পথ দেখাল। বলল : এই সেই পথ।

বুঝতে না পেরে আমি তার মুখের দিকে তাকালুম।

এরই মধ্যে ভুলে গেলে : রাজাগোপালন আমার স্মরণ শক্তির উপর কটাক্ষ করল : সেই ছোকরার কথা মনে নেই, পেদ্দাচেরুভুর বাস স্ট্যাণ্ডের সেই ছোকরা ?

ভুলে আমি যাইনি। ভোলার ভান করেছি মাত্র। সেই ছোকরার কথামতো এই বাঁ হাতের পথ ধরলে আমাকে আর দেশে ফিরতে হবে না। পূর্বঘাট পাহাড়েই আমার সমাধি হবে।

রাজাগোপালন বলল : বেশি দূর নয়। যাওয়া আসায় মাত্র দু ক্রোশ। এটুকু পথ আমি তোমায় তামিল শেখাব।

তার আগ্রহ দেখে প্রস্তাব মেনে নিলুম। বললুম : তথাস্তু।

কৌতূহল আমারও ছিল। গোবিন্দ স্বামীর মন্দির বহুদিনের অনাদৃত। জীর্ণ ভগ্নপ্রায়। সম্প্রতি গোবিন্দ স্বামী নাকি জাগ্রত হয়েছেন। গ্রামের এক ব্রাহ্মণ কন্যার সঙ্গে আলাপ করেন নিভৃতে। মন্দিরের বাহিরে কান পেতে সেই আলাপ শোনা যায়।

তুমি বিশ্বাস কর একথা ?

পথ চলতে শুরু করে রাজাগোপালনকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলুম।

করিনা : স্পষ্টভাবে উত্তর দিল রাজা গোপালন : তবু সব খবর কেন নিলুম, তাই জানতে চাইছ তো ?

উত্তর সে নিজেই দিল। বলল : কৌতূহল। গায়ে পড়ে এই খবর কেন দিচ্ছে, তাই জানবার ইচ্ছে। লোকটার কোন মৎলব আছে।

বললুম : ডাকাতির নয় তো ? এই দুর্গম পথে কেটে ফেললেও কেউ জানতে পারবে না।

ভয় পাচ্ছ বুঝি ?

হেসেছিল রাজাগোপালন। সম্মতি দেবার আগে তার হাসিটুকুও মনে পড়ল।

শ্রীশৈলমের পথ ছেড়ে বনের ভিতর ঢুকতেই রাজাগোপালন খুশী হয়ে উঠল। বলল : সেদিন কী জিজ্ঞেস করেছিলে তামিল ভাষায় ?

হেসে বললুম : আর লজ্জা দিওনা। আমার বিদ্যে ঐ পর্যন্ত।

উৎসাহ দিয়ে রাজাগোপালন বলল: তোমাদের ভাষায় আমার যে ওটুকু বিদ্যেও নেই।

রাজাগোপালন পিছন ফিরে দেখল, এ পথে আর কেউ আসছে না। তারপর বলল: বল আর একবার।

আইয়া নাল্লা ইর্‌কে রিঙ্গলা?

নাইডু নামে আমার এক বন্ধু ছিল দেশে। তার কাছেই এই কথাটি শিখেছিলুম। মানে, কেমন আছেন মশাই?

রাজাগোপালন প্রথম দিন শুধু হেসেছিল। আজ জবাব দিল: কোন কায়স্থ তোমায় শিখিয়েছে, তাই না?

নাইডু ব্রাহ্মণ নয় জানি! কিন্তু ভাষা শুনলে যে জাত বলা যায় তা জানতুম না।

রাজাগোপালন বলল: ভাষাও ঠিক ভদ্রলোকের নয়। ছোটলোকের কাছে শেখা।

আমি আরও আশ্চর্য হলুম।

রাজাগোপালন বলল: ভদ্রলোককে আইয়া বললে কটু শোনায়, আয়ুর ওয়াল বলতে পার। তেমনি নাল্লা। নান্‌ড্রয় ইরুক্রিকলা বরং ভাল শোনায়।

চলতে চলতেই আমি তার মুখের দিকে তাকালুম।

রাজাগোপালন বলল: তার চেয়ে বল, নিঙ্গ্‌ল্‌ সৌক্যোমায় ইরুকক্রিকলা? আমি উত্তর দেব, নান্নুম সৌক্যেম।

রাজাগোপালন আরও শেখাল অনেক কথা। ওয়ারুঙ্গ্‌ল মানে আসুন, আমরুঙ্গ্‌ল মানে বসুন, ইন্না সমাচারম্‌ মানে কী খবর, ইত্যাদি। সব কথা মনে রাখবার দায়িত্ব যখন নেই, তখন শিখতে মন্দ লাগে না। আমিও শিখলুম কিছু।

এক সময় থামতে হল। বনের ভেতর মন্দিরের মত কী যেন দেখা যাচ্ছে। সাদা নয়, সবুজ। গাছের নূতন পাতার মতো। হয়তো একসময় সাদা ছিল, আজ বয়সের ছাপ পড়েছে। কাছে এগিয়ে

দেখলুম, মন্দির বলে যা ভ্রম হয়েছিল, তা একটা ভাঙ্গা গোপুরম। চারিদিকের দেওয়ালও ভেঙ্গে পড়েছে। আর মূল মন্দির আড়াল করে আছে একটি ঘন-পত্র অশ্বত্থ গাছ।

কিছু যাত্রী ওধার থেকে ফিরে আসছে। ভাবে গদগদ তারা।

রাজাগোপালন অনেকক্ষণ ধরে তাদের নানা প্রশ্ন করল নিজের ভাষায়। আমাকে যা শিখিয়েছে, সেই বিদ্যে নিয়ে তাদের আলাপের একবর্ণও হৃদয়ঙ্গম করা গেল না। যাত্রীদের বিদায় দিয়ে রাজাগোপালন আমাকে বোঝাতে লাগল। বলল: ব্যাপারটা এরা বিশ্বাস করেছে।

বললুম: গোবিন্দ স্বামীর কথা?

রাজাগোপালন চিন্তিত ভাবে বলল: এরা রাত্রিবাস করেছিল। বললে গভীর রাত্রে নাকি মন্দিরের ভেতর কথাবার্তা শোনা যায়। মেয়েটা—

আমি বাধা দিলুম না।

মেয়েটা নাকি ছুটতে ছুটতে আসে। এসে মন্দিরের ভেতর আশ্রয় নেয়। সেখানেই থাকে সারারাত।

একটু থেমে বলল: আজ আমরাও রাতে থাকব।

রাজাগোপালনের চোখে আমি যেন বিহ্বলতা দেখলুম। ধর্মপ্রাণতা যে দক্ষিণের বৈশিষ্ট্য, এই মুহূর্তে সে তার প্রমাণ দিল। তার মুখের অবিশ্বাস ছাপিয়ে উঠল মনের গোপন দুর্বলতা।

আশ্চর্য হয়ে বললুম: এখানে রাত্রিবাস কোথায় করবে?

রাজাগোপালন কিছুমাত্র চিন্তা করল না। বলল: তার জন্যে ভাবনা করনা। ব্যবস্থা একটা হবেই।

চারিদিকের ঘন অরণ্য দেখলুম আমি। আর দেখলুম কিছু তাল আর নারিকেল গাছের নিচে ছোট দুটি কুটীর। বোধহয় মন্দিরের পূজারী ব্রাহ্মণের।

রাজাগোপালন আমার ভাবনা দেখে বলল: কিছুরই দরকার

নেই। মন্দিরের গা ঘেঁষে এই যে ফালি জমিটুকু, এরই ওপর রাত কাটিয়ে দেব।

তারপর আমার মুখের দিকে চেয়ে বলল : কেন, ভয় হচ্ছে ? শীত নেই, আকাশে মেঘও নেই, ভাবনা কী ?

আমার মন ছিল অন্য দিকে। আমি চারিদিকের শোভা দেখছিলুম। সেই সঙ্গে এক গৌরবময় অতীতের পরিচয় পেয়ে গেলুম। পায়ের নিচে শুধু ঘাসই নয়, পাথরের মতো শক্ত কিছু ঠেকছিল। মনে হল, এখানে কোন সময় বাঁধানো চত্বর ছিল। আর সেই চত্বরের মাঝখানে নাট মন্দিরের চিহ্ন আজও বিদ্যমান। ছাদ নেই, শুধু কতকগুলো থামের ভিত্তি ঘাসের বাহিরে জেগে আছে। স্থানে স্থানে ইঁটের স্তূপ আছে, তার উপর আগাছা গজিয়ে অতীতটাকে গোপন করেছে। দরিদ্র পরিবারের পর্দা টাঙ্গিয়ে ভিতরের দারিদ্র্য ঢাকবার চেষ্টার মতো।

আমার উত্তর না পেয়ে রাজাগোপালন আবার প্রশ্ন করল : কী ভাবছ ?

বললুম : যা ভাবা উচিত, তাই ভাবচি।

আমার উত্তরটা ধরতে না পেরে সে আমার মুখের দিকে তাকাল।

বললুম : কালো পাথরের এই গর্ভ গৃহ দেখ, তারপর দেখ এই সব।

বলে সেই ভাঙ্গা ইঁট আর পাথরের স্তুপ দেখালুম।

বস্তু জগৎ থেকে ফিরে আসতে রাজাগোপালনের একটা মুহূর্তও সময় লাগল না। এই পরিবেশের গভীরতার ভিতর সহজে ডুবে গেল।

এবারে আমি প্রশ্ন করলুম : কী ভাবছ ?

রাজাগোপালন চমকে উঠল, বলল : কী ভাবছি ?

একটু থেমে বলল : তোমার মনে হচ্ছে না যে আমরা একটা শ্মশানের ওপর দাঁড়িয়ে আছি।

চারিদিকে জনমানব নেই। মন্দিরের দ্বার বন্ধ করে পুজারী বিশ্রামে গেছেন। অপরাহ্ণে আবার হয়তো ফিরবেন। আমাদের চিন্তায় কোন বাধা পড়ল না। বললুম : কেন একথা মনে হচ্ছে বলতে পার ?

রাজাগোপালন ভাবল খানিকক্ষণ, তারপর জবাব দিল : ঠিক এই কথা মনে হয়েছিল হাম্পির মাঠে দাঁড়িয়ে। সেখানে বিজয়নগরের ধ্বংসস্তূপ।

বললুম : বিজয়নগরের রাজারা বোধহয় এ মন্দির দেখতে পাননি। পেলে আজ এর এ দশা হত না।

কেন ?

বললুম : এ মন্দির কেউ ধ্বংস করেনি। মনে হচ্ছে, আপনিই ভেঙে পড়েছে। বিজয়নগরের হাত পড়লে এ মন্দির আজও দাঁড়িয়ে থাকত।

অপরাহ্ণে ব্রাহ্মণ এসে মন্দিরের দ্বার খুললেন। আমরা বিষ্ণুর দর্শন পেলুম। কালো পাথরের মূর্তি, নিরাভরণ, সাজ নেই সজ্জা নেই। সামান্য পূজার উপকরণ, কিছু তুলসীর পাতা আর বন্য ফুল।

এই পরিবেশের ভিতর পূজারী ব্রাহ্মণকে আশ্চর্য মানিয়েছে। শীর্ণ দেহ, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, দুর্বল কঙ্কালসার। জীর্ণ বস্ত্র পরিধেয়, নগ্ন গাত্র। কাঁধে একখণ্ড নামাবলী, নাম মুছে গেছে। সরল নিরহঙ্কার স্পষ্টবাদী ব্রাহ্মণ সদালাপী। সব শুনে বললেন : অনর্থক রাত্রিবাস করবেন।

অনর্থক কেন ?

রাজাগোপালন জিজ্ঞাসা করল।

ব্রাহ্মণ হাসলেন, বললেন : দেবতার কথা শুনতে পাব, সে ভাগ্য আমার নয়।

আমি এঁদের কথোপকথন বুঝি না। অনেকক্ষণ ধরে কথা হল। তারপর ব্রাহ্মণ বিদায় নিলে আমি সব জানতে পেলুম। রাজা গোপালন অনেক খবর সংগ্রহ করেছে। তবু মনে হল, সবই যেন জানতে বাকি রয়ে গেল।

ব্রাহ্মণের সন্তান একটি, পুত্র সন্তান। সাবালক হয়েছে। কিন্তু মন্দিরের পূজার দায়িত্ব নিতে অনিচ্ছুক। তার দ্বিবিধ কারণ। প্রথমত, আজীবন দারিদ্র্য বরণ করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ কারণ পারিবারিক। একথা বলতে নাকি ব্রাহ্মণ সঙ্কোচ বোধ করেছিলেন। না বলতে হলেই বোধহয় আরাম পেতেন। নিকটে এক সম্পন্ন ব্রাহ্মণ পরিবার আছেন। ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ। কিছু জমি জমা আছে, ভৃত্য আছে, আর আছে মল্লিকার্জুন মন্দিরের সঙ্গে কিছু যোগাযোগ। এঁরই এক কন্যার পাণিপ্রার্থী হয়ে তাঁর পুত্র নিতান্ত অপমানিত হয়েছে। ব্রাহ্মণ স্বীকার করেছেন যে অপরাধ তাঁর পুত্রেরই। দুবেলা দুমুঠো অন্নের সংস্থান যাদের নেই, এমন প্রস্তাব করা তাদের ধৃষ্টতা ভিন্ন আর কিছু নয়। সে যুবক এখন গৃহত্যাগী। নিজের ভাগ্যান্বেষণে গেছে।

ব্রাহ্মণের চোখে আমি জল দেখেছিলুম। সেই প্রশ্নের উত্তরে রাজাগোপালন বলল: দেবতার ভবিষ্যৎ ভাবছেন দরিদ্র ব্রাহ্মণ। তাঁর অবর্তমানে গোবিন্দ স্বামীর সেবা বন্ধ হয়ে যাবে।

মন্দিরের এই অলৌকিক ঘটনা সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ কী মনে করেন, আমি জানতে চাইলুম। রাজগোপালন বলল: সে কথাও জিজ্ঞেস করেছি। তিনি বললেন যে এ তাঁর সেই প্রতিবেশী ব্রাহ্মণের কন্যা, যাকে তাঁর ছেলে বিয়ে করতে চেয়েছিল। এর ভেতর কিছু মানসিক বিকার থাকা বিচিত্র নয়।

কিন্তু ব্রাহ্মণ তো তার সুযোগ নিতে পারেন?

আমি জিজ্ঞাসা করলুম।

রাজাগোপালন বলল: সে কথাও আমি বলেছিলুম। কিন্তু ব্রাহ্মণের উত্তর শুনে আশ্চর্য হবে। বললেন, এমন দুর্মতি হবার

আগে তাঁর যেন মৃত্যু হয়। তিনি দেবতার সেবা করেন, তাঁর নিজের সেবা নয়। তুকতাক ভেল্কি দেখিয়ে পয়সা রোজগারের আরও অনেক উপায় আছে।

মনে মনে ব্রাহ্মণকে আমি প্রণাম করলুম। কিন্তু আমাদের প্রশ্নের উত্তর তাতে সম্পূর্ণ হয়না। বললুম: মন্দিরের ভেতর তাহলে কারা কথা কয়?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রাজাগোপালন বলল: সে আমাদের নিজের চোখে দেখতে হবে।

কিছু পরে ব্রাহ্মণ আবার ফিরে এলেন। দুহাতে দুটি ডাব। যত্ন করে মুখ দুটি কাটা। বললেন: আপনারা আমার সম্মানিত অতিথি, এর বেশি সঙ্গতি আমার নেই।

ব্রাহ্মণের কথা আমি বুঝিনি, কিন্তু তাঁর মুখে চোখে আন্তরিকতা দেখলুম অপরিমেয়। হাত বাড়িয়ে ডাব দুটি আমরা গ্রহণ করলুম। এই সময় আমার আর একটি কথা মনে এল। মন্দিরের এক কোণে একখানা থালার উপর অনেক পয়সা কড়ি দেখেছি। সেই কথা বললুম রাজাগোপালনকে।

তার মুখে এই প্রশ্ন শুনে ব্রাহ্মণ হাসলেন। যা বললেন, রাজা গোপালন আমায় তা বুঝিয়ে দিল। ও টাকা তাঁর নয়। তাঁর গোবিন্দ স্বামীকে কেউ দেয় নি। যে সব যাত্রীরা কিছুদিন থেকে রাত্রিবাস করতে আসছে, ও টাকা তাদের দেওয়া। তারা ভেল্কি দেখে তার দাম দিয়ে গেছে। ব্রাহ্মণ মেয়েটাকেই দিয়েছিলেন ঐ টাকা। মেয়েটা নেয়নি।

ব্রাহ্মণের দৃষ্টিতে আমি একটা ঘৃণার ভাব প্রত্যক্ষ করলুম।

মন্দিরের প্রাঙ্গণে তখন সায়াহ্নের অন্ধকার নামতে শুরু করেছে। একদল যাত্রী এল কলরব করতে করতে। ব্রাহ্মণ বললেন: মল্লিকার্জুন থেকে এঁরা ফিরছেন। সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করেই যে আসচেন, তাতে সন্দেহ নেই। সারারাত্রি জেগে এঁরা দেবতার

অলৌকিক ক্রিয়া দেখবেন, তারপর গদগদ চিত্তে প্রচুর প্রণামী দিয়ে দেশে ফিরবেন।

আমি লক্ষ্য করে দেখলুম, ব্রাহ্মণ আর অপেক্ষা করতে চাইলেন না। এইসব যাত্রীর উপর একটা কটাক্ষ নিক্ষেপ করে নিজের কুটীরের দিকে যাত্রা করলেন।

খানিকক্ষণ নিঃশব্দে থেকে আমিই প্রথম কথা বললুম: ব্রাহ্মণ সবার সামনে যে এইসব কথা বলেন তা মনে হয়না। কিন্তু আমাদের কেন বললেন বলতে পার?

রাজগোপালনও কিছু ভাবছিল, বলল: জানিনা।

একটু থেমে বলল: আমাদের চেহারা বোধহয় সাধারণ যাত্রীর মতো নয়।

তা হবে।

কিন্তু সাধারণ যাত্রীর মতো আমরাও এবারে রাত্রির অপেক্ষা করতে লাগলুম।

এক সময় মনে হল, রাত্রি বুঝি গভীর হয়েছে। কোনদিকে আলোর সন্ধান নেই। প্রতীক্ষায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সমবেত যাত্রীরা। চারিদিকের বড় বড় গাছ ছায়া বিস্তার করে নির্বাক প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে আছে। অশ্বত্থ গাছের ডালে একটু পাখার ঝটপট শব্দ, আর কখনও কোন যাত্রীর খকখক করে কাশি। পাশে একজন দেশলাই জ্বেলে বিড়ি ধরাল। সেই আলোয় ঘড়ি দেখলুম। আটটা বেজে আটচল্লিশ মিনিট কিংবা নটা বেজে বিয়াল্লিশ। কাঁটা দুটো ছোট বড় এত কম যে চট করে বোঝা যায় না।

হঠাৎ যাত্রীরা যেন সজাগ হয়ে উঠল। ভাল করে তাকিয়ে দেখলুম, একটি প্রদীপ হাতে দুটি মানুষ এদিকে আসছে। ব্রাহ্মণকে আমি চিনতে পারলুম তাঁর চলার ভঙ্গি দেখে। সঙ্গে বোধহয় তাঁর ব্রাহ্মণী। এবারে গোবিন্দ স্বামীর শয়নারতি হবে। যাত্রীদের মধ্যে একজন জয় ধ্বনি করে উঠল।

ঠিকই সন্দেহ করেছিলুম! হাতে নৈবেদ্য আর কাঁকালে জলের কলসী নিয়ে ব্রাহ্মণী এলেন। ব্রাহ্মণ যতক্ষণ ধ্যানস্থ হয়ে রইলেন, ব্রাহ্মণী সব উপচার সাজালেন একে একে।

স্বামীর ভোগ মূর্তি কই?

কে একজন প্রশ্ন করল।

আর একজন বলল: লক্ষ্মী দেবী?

কিন্তু উত্তর দেবার এখানে লোক নেই।

ব্রাহ্মণ যখন উঠে দাঁড়ালেন, ব্রাহ্মণী বাহিরে এলেন একটা বড় কালো ঘণ্টার কাছে। অস্পষ্ট আলোকে আমি তাঁকে দেখলুম। রক্ত মাংসের মানুষ মনে হলনা। মনে হল, মানুষের একটা ছায়া দেখছি। শীর্ণ দুর্বল একটি নারী মূর্তির ছায়া। ব্রাহ্মণের বাঁ হাতে একটি পিতলের ঘণ্টা বাজছে ঠিনঠিন করে। সেই শব্দের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ঘণ্টার দড়ি টানতে তিনি পারছিলেন না। আমি তাঁর সাহায্যের জন্য এগিয়ে গেলুম।

বড় সংক্ষেপে ব্রাহ্মণ আরতি করলেন। একটু প্রদীপ, একটু কর্পূর আর একটুখানি চামরের ব্যজন। তাতেই মনে হল ক্লান্ত হয়ে পড়লেন।

হাতের ঘণ্টা রেখে ব্রাহ্মণ যখন আবার ধ্যানস্থ হয়ে বসলেন, বাহিরে যাত্রীদের কোলাহল হঠাৎ বেড়ে উঠল।

ঐ আসছে, ঐ আসছে।

কে আসছে আমরা জানি। তার নূপুরের নিক্কণ শুনতে পেয়েছি। মন্দির বন্ধ হবার আগে সেই কন্যা ভিতরে প্রবেশ করবে। প্রথম দিনকয়েক অনেক চেষ্টাতেও নাকি ব্রাহ্মণ তাকে বার করে দিতে পারেননি। সে সামর্থ তাঁর শরীরে নেই। আজকাল সে চেষ্টাও করেন না। আরতির শব্দ পেলেই মেয়েটি আসে। সারারাত্রি থাকে মন্দিরের ভিতর, একান্তভাবে একা। কথা কয়, গল্প করে। তারপর ঘুমোয় অনেক বেলা পর্যন্ত। প্রভাতে মন্দিরের দরজা খুলে ব্রাহ্মণ তাকে ডেকে তোলেন।

মেয়েটির নিজের বাড়ি থেকেও লোক এসেছে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য। তাতে সে ভর্ৎসনা করেছে, গোবিন্দ স্বামী রাগ করবেন বলে ভয় দেখিয়েছে! তিনি রাগ করলে কেউ আর রক্ষা পাবে না।

আজ দেখলুম, এ সবই যেন গা-সওয়া হয়ে গেছে। যে কয়জন যাত্রী দরজার কাছে ভিড় করেছিল, তারা সরে দাঁড়াল। মেয়েটি মন্দিরের ভিতরে গিয়ে দেবতার বেদীর কাছে বসল। ব্রাহ্মণী তার সঙ্গে কথা কইতে লাগলেন, প্রদীপের মৃদু আলোয় আমরা তাকে চোখ ভরে দেখলুম। তার নিজের বাড়ি থেকে কেউ তাকে নিতে এলনা।

মন্দিরের কাজ সমাপ্ত করে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী বেরিয়ে এলেন। দরজায় তালা দিলেন। তারপর যেমন এসেছিলেন, তেমনি ধীরে ধীরে কুটীরে ফিরে গেলেন। অন্ধকারের ভিতর আমরা দাঁড়িয়ে রইলুম। যারা বেশি উৎসাহী, তারা মুখ বাড়িয়ে মন্দিরের ভিতরটা ভাল করে দেখে নিল। দেখে তারা আগেও নিয়েছিল, ভাল করে পরীক্ষা করে রেখেছে বাহিরে থেকেও। বড় টর্চ তাদের সঙ্গে আছে। যে খবর শুনে তারা এসেছে, তাকে তারা ভাল করে যাচাই করে ফিরবে। সত্যি বলতে কি, এইসব দেখে আমাদের কৌতূহলও যেন বাড়ল। মনে মনে লজ্জা বোধ করলুম।

রাজাগোপালন আমার হাত ধরে টানল, বলল: এস, শোবার মতো একটু জায়গা করে নেওয়া যাক। ভিড়তো মন্দ হয়নি।

সত্যি কথা। মন্দিরের দরজা থেকে আমি নেমে এলুম। তারপর মন্দিরের গায়েই একটুখানি শক্ত জায়গার উপর সতরঞ্চি বেছালুম। পিঠের ঝোলাটা করলুম মাথার বালিশ। গা এলিয়ে দিয়ে মনে হল, এমন আরামের শয্যায় অনেকদিন বুঝি শুইনি। ক্লান্ত চোখজোড়া ঘুমে বুজে এল।

রাজাগোপালন আমার দিকে চেয়ে একটুখানি হাসল। পাশের যাত্রীটিকে তার নিজের ভাষায় কী অনুরোধ করে আমায় বলল: নিশ্চিন্তে ঘুমোও। সময় মতো এরা আমাদের ডেকে দেবে

আমার মন তখন স্বপ্ন রাজ্যে চলে গেছে। আমি ভাবছিলুম সেই যুগের কথা, যখন এই মন্দিরে নানা উৎসব হত, যাত্রী আসত দেশ দেশান্তর থেকে। সপ্ত-সাগর পেরিয়ে। মন্দিরের পিছনে ছিল টেম্পাকুলম সরোবর। সেখানে অবগাহন করে যাত্রীরা আশ্রয় নিত সহস্র-স্তম্ভ মণ্ডপের নিচে। সাত রাজার ধন ছিল মন্দিরের কোষাগারে। হীরা ও মণি-মুক্তার অলঙ্কার। উৎসবের দিনে গোবিন্দ স্বামী এইসব অলঙ্কার পরতেন। সবচেয়ে বড় উৎসব হত মাঘ মাসের বৈকুণ্ঠ একাদশীতে। গোবিন্দ স্বামী সেদিন শোভাযাত্রা করে বৈকুণ্ঠধাম যাবেন। হাতীশালার থেকে হাতী বেরবে, বেরবে সোনার পাল্কী, সোনার রথ। লক্ষ ভক্ত একত্র হবে সেদিন। আরও কত উৎসব! রোজই তো উৎসব। যেমন রামেশ্বরের হয়, মাদুরার মীনাক্ষী দেবীর হয়, আর হয় শ্রীরঙ্গমে রঙ্গনাথ স্বামীর। আশপাশের সমস্ত গ্রাম ছিল গোবিন্দ স্বামীর, গোশালে হাজার গাভী ছিল দুগ্ধবতী। সেই দুধে পরমান্নের ভোগ হত, প্রসাদ পেত লক্ষ যাত্রী। মন্দিরের প্রধান পুরোহিত নিজে উপস্থিত থেকে সবাইকে খাওয়াতেন।

সন্ধ্যাবেলা গল্পের আসর বসত মন্দিরের নাটমণ্ডপে। তানপুরা বা বীণের সঙ্গে গাইতেন বড় বড় সঙ্গীতজ্ঞ, রাগ শঙ্করাভরণ চক্রভাগম টোরী কল্যানী রাগমল্লিকা। দেবদাসীর নৃত্য হত। বিষ্ণুর কোন উপাখ্যান গাইতেন গায়ক, আর দেবদাসী তাঁর নৃত্যের মাধ্যমে সেই গল্পটি যাত্রীদের বুঝিয়ে দিতেন। মনে হল, সেই নৃত্যের শব্দ আমার কানে ভেসে আসছে।

রাজাগোপালন ঠেলা দিয়ে আমায় জাগিয়ে দিল। বলল: ওঠ।

ধড়মড় করে আমি জেগে উঠলুম। চারিদিকে চেয়ে আশ্চর্য হয়ে গেলুম। অন্ধকারে সব একাকার হয়ে আছে। মন্দির কোথায় আর কোথায় নাটমণ্ডপ। মনে পড়ল, রাতে আজ আমাদের আহার জোটেনি। মন্দিরের পূজারী এখানে উপবাস করেন।

কিন্তু দেবদাসীর নৃত্য যেন শুনতে পাচ্ছি। উৎকর্ণ হয়ে শুনলুম,

মন্দিরের ভিতর নৃত্য হচ্ছে। দেওয়ালে কান লাগিয়ে বসেছিল রাজাগোপালন। আমিও তেমনই করে বসলুম।

এক সময় নৃত্য বন্ধ হল। মনে হল, মেয়েটি একা কথা কইছে। বড় মৃদু, স্পষ্ট কিছুই নয়। বাহিরের সব যাত্রী পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে শুনছে। একটানা, অনেকক্ষণ। হঠাৎ একবার গভীর গলার শব্দ হল। মাত্র একবার, একটিমাত্র শব্দ। তারপরেই আবেগে পুলকে মেয়েটি উচ্ছল হল। নূতন উৎসাহে নৃত্য হল শুরু। নিঃশব্দে আমি রাজা গোপালনের দিকে তাকালুম। বিস্ময়ে সে হতবাক হয়ে গেছে।

অন্ধকারে যাত্রীদের মুখ দেখা যাচ্ছিল না। তাদের নিঃশ্বাসের শব্দও পাচ্ছিনা। শ্বাস রোধ করে আমরাও জেগে রইলুম।

এবারে নৃত্য শেষ হতেই হাতে তালি পড়ল। স্পষ্ট শুনলুম দু রকমের তালি। হাল্কা হাতের ভিতর ভারি হাতেরও। তারপরেই সমস্ত নিস্তব্ধ।

আমরা আরও অনেকক্ষণ জেগে রইলুম। তারপরে ঘুমিয়ে পড়লুম একে একে।

সকাল বেলায় যাত্রীদের কলরবেই ঘুম ভাঙল। ব্রাহ্মণ এসেছেন মন্দিরের দরজা খুলতে। অধীর আগ্রহে তারা দেবদর্শনের অপেক্ষা করছে।

ব্রাহ্মণ দরজা খুললেন। জাগালেন সেই ঘুমন্ত মেয়েটিকে। যাত্রীরা সেই মেয়েটিরও পায়ের ধূলো নিল। টাকা পয়সাও দিল তার পায়ে। গোবিন্দ স্বামীর পূজার থালাতেও দিল অনেক।

আমি পূজারী ব্রাহ্মণকে লক্ষ্য করছিলুম। কোনদিকে না চেয়ে তিনি পূজার সরঞ্জাম গোছাতে লাগলেন।

মেয়েটি কিছুই নিল না। ধীর পদক্ষেপে নিজের বাড়ির দিকে ফিরে গেল। উৎফুল্ল মনে যাত্রীরাও ফিরে চললেন। তাদের আসা সার্থক হয়েছে। দেবতার কণ্ঠস্বর শুনেছে স্বকর্ণে, সার্থক ভাবছে নিজের মানব জীবন।

রাজাগোপালনকে আমি বড় বিচলিত দেখলুম। সে কিছু অশান্ত হয়ে উঠেছে।

কিছুক্ষণ পরে ব্রাহ্মণী এলেন মন্দিরে। বাহিরের টাকা পয়সা জড়ো করে থালায় তুলে রাখলেন। দেবতার সামনের থালাটিও সরিয়ে রাখলেন মন্দিরের এক কোণে।

আমি তাঁকেও লক্ষ্য করলুম। টাকা পয়সা গুছিয়ে তুলে রাখবার যত্ন দেখে মনে হল, ঐ অর্থ নিজের গৃহে নিয়ে তুলতে পারলে হয়তো আরও খুশী হতেন। বুঝি তার উপায় নেই। কিন্তু তার জন্য দুঃখ দেখলুম না তাঁর চোখে।

আমার আর একটি প্রশ্ন জানবার ছিল। রাজা গোপালনকে সে প্রশ্ন জানালুম। ব্রাহ্মণীকে জিজ্ঞাসা করে সে তার উত্তর জেনে নিল। তাঁর ছেলে গৃহত্যাগী হয়েছে এই অলৌকিক ঘটনা ঘটবার পর থেকে। চেহারার যে বর্ণনা দিলেন ব্রাহ্মণী, তাতে মনে হল, পেদ্দাচেরুভুর বাস স্ট্যাণ্ডে তাকে আমরা দেখেছি। মন্দিরের সংবাদ পেয়েছি তারই কাছে।

ব্রাহ্মণী নিজে থেকে আরও একটু খবর দিলেন। তাঁর ছেলে ফিরে এলে ঐ মেয়ের সঙ্গেই তাঁর ছেলের বিয়ে হবে। এতদিনে মেয়ের বাপ রাজী হয়েছেন।

আপনি এ ঘটনা বিশ্বাস করেন ?

রাজাগোপালন তাঁর কাছে জানতে চাইল।

শ্রান্ত স্বরে ব্রাহ্মণী উত্তর দিলেনঃ অত ভাগ্য কি আমাদের হবে !

বিদায় নেবার সময় ব্রাহ্মণকে প্রণাম করল রাজাগোপালন। তার সমস্ত অর্থ তাঁরই পায়ে ঢেলে দিল।

বিস্ময়ে হতবাক হলেন পূজারী ব্রাহ্মণ।

রাজাগোপালন বলল : আমি আপনাকে প্রণাম করলুম।

প্রভাতের প্রসন্ন রোদে আমি ব্রাহ্মণের অন্য রূপ দেখলুম। আমিও প্রণাম জানালুম তাঁর নগ্ন পায়ে।

আট

বড় নিঃসঙ্গ মনে হত দক্ষিণ দেশে। কবে মুক্তি পাব, সেই চিন্তা জাগত মাঝে মাঝে। একদিন সত্যিই মুক্তি পেলুম। পাঁচশালা পরিকল্পনায় ঘর্ঘরার বাঁধ হচ্ছে। সেই বাঁধে একটা কাজ পেয়ে গেলুম।

কিন্তু মাদ্রাজ ছাড়বার আগে সিংহলের কথা মনে পড়ল। এত কাছে এসেও সিংহল না দেখে ফিরব!

কী একটা কাজে আইয়ার যাচ্ছিলেন সিংহলে, বললেন: সত্যি তো, সিংহল না দেখে কেন ফিরবে!

উৎসাহও দিলেন তিনি। শেষ পর্যন্ত তাঁরই সঙ্গে ভেসে পড়লুম।

কয়েকটা দিনে যা দেখলুম, আমার কাছে আজও তা অমূল্য হয়ে আছে।

সিংহলের প্রাচীনতম রাজধানী অনুরাধাপুরের ভগ্নাবশেষ দেখলুম। পবিত্র বৌদ্ধ শহর হওয়া সত্ত্বেও দ্বাদশ শতাব্দীতে সিংহলবাসী একে পরিত্যাগ করে যায়। খ্রীষ্টের জন্মের তিনশো বছর আগে তৈরি ইসুরুমুনি পর্বত মন্দির দেখে মুগ্ধ হয়েছিলুম। দেখেছিলুম পোলোন্নারুবার প্রাচীন রাজপ্রাসাদ। অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত রাজারা এখানে বাস করেছেন। আটান্ন ফুট ব্যাসের উপর নির্মিত হয়েছে ওয়াটা ডগবা। মর্মরের দ্বারপাল রক্ষিত তার সোপান শ্রেণী। দেখেছিলুম পর্বত মন্দির গলে বিহার। গ্র্যানাইট পাথর কেটে তৈরি তিনটি বিরাট মূর্তি। তিরিশ হাতের কম হবেনা বুদ্ধের শায়িত মূর্তিটি।

আরও কত কী দেখেছিলুম কত জায়গায়। দেখতে পারিনি শুধু

কবি কালিদাসের শ্মশানক্ষেত্র। মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ সিংহল ভ্রমণ করে এসে বলেছিলেন যে মহাকবির শ্মশানকৃত্য সম্পন্ন হয়েছিল 'কালিন্দী নদী ও সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে পুষ্পিত লতা বেষ্টিত নারিকেল কুঞ্জের মধ্যে'। তিনি কোন্ দেশবাসী ছিলেন, সে বিষয় মতান্তর আছে। কিন্তু সিংহলপতি কুমারদাস যে তাঁকে সিংহলে আমন্ত্রণ করে নিয়ে যান, তার সপক্ষে যুক্তি আছে অনেক। রাজা কুমারদাস তাঁর কবিত্বের সাক্ষর রেখে গেছেন স্বরচিত সংস্কৃত কাব্য 'জানকী হরণে'। কবি হয়ে কবির সমাদর করবেন, এই যুক্তিই বোধহয় ঐতিহাসিকের শ্রেষ্ঠ যুক্তি।

সিংহলের তালাইমান্নার থেকে নোঙ্গর তুলে ছোট জাহাজখানা যখন ধনুস্কোডির দিকে ভাসল, বাহিরে ডেকে দাঁড়িয়ে এক অদ্ভুত ভাবনা এল মনে। একদা স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, তিনি বৌদ্ধ নন, আবার বৌদ্ধও বটে। চীন জাপান বা সিংহল যেমন সেই মহামানবের উপদেশ মেনে চলেছে, ভারত তাঁকে পূজা করছে বিষ্ণুর অবতার রূপে। মনে হল, বুদ্ধকে পূজা করি, অথচ বৌদ্ধ নই এ কেমন যুক্তি!

সহযাত্রী আইয়ার এসে পাশে দাঁড়ালেন। একসঙ্গে এক গাড়িতে এসেছি তালাই মান্নার, ধনুস্কোডি থেকে এক গাড়িতেই ফিরব মাদ্রাজে, তারই আগ্রহে এসেছি। আমাকে গম্ভীর দেখে প্রশ্ন করলেন : সিংহলের মায়া এখনও কাটলনা?

সত্যিই কাটেনি, চোখের সামনে থেকে ও দেশের 'বনরাজিনীলা' তখনও একেবারে অন্তর্হিত হয়নি। আরও যা নিয়ে যাচ্ছি বুকের ভিতর লুকিয়ে, তারই খানিকটা আভাষ দিলুম আইয়ারকে।

খানিকক্ষণ নীরব রইলেন আইয়ার। তারপর বললেন : বুদ্ধ কী করে বিষ্ণুর অবতার বলে গণ্য হলেন, সে সম্বন্ধে একটা মন্তব্য শুনেছিলুম এক বন্ধুর কাছে। ধর্মের নামে ব্রাহ্মণরা যখন অত্যাচার শুরু করেছেন, ভারতের সেই দুর্দিনে ভগবান বুদ্ধ জন্ম নিলেন ধর্ম

সংস্থাপনার্থায়। তাঁর উপদেশ শুনে ব্রাহ্মণের দল প্রমাদ গনলেন। ভাবলেন সারা দেশটাই হয়তো বৌদ্ধ হয়ে যাবে। আত্মরক্ষার জন্য বুদ্ধকে বললে বিষ্ণুর নবম অবতার। আর নিজেদের এই উক্তিকে প্রাচীন প্রমাণ করবার জন্য রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণকেও অবতার আখ্যা দিলেন।

জিজ্ঞাসা করলুম ঃ তাতে লাভ কী হল?

আইয়ার বললেন ঃ লাভ এইটুকুই যে সাধারণ লোককে জানানো হল, বুদ্ধ নতুন কিছুই নয়, আমাদের হিন্দুদেরই একজন।

আজ আর তর্কের প্রবৃত্তি হলনা। চুপ করে রইলুম। জানি, আমার প্রশ্নের জবাব নেই আইয়ারের জ্ঞানের ভাণ্ডারে।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে বিষ্ণুর কৃষ্ণ অবতার যে গীতা শোনালেন যুদ্ধক্ষান্ত অর্জুনকে, হিন্দুর ঘরে ঘরে সেই গীতা আজও পরম শ্রদ্ধায় পঠিত হচ্ছে। কিন্তু সেই বিষ্ণুরই বুদ্ধ অবতার যে মহান সত্য প্রচার করলেন বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্য, নিজের জন্মভূমিতেই সেই উপদেশ তার যোগ্য সম্মানলাভে বঞ্চিত হল। তবে কি আমরা বুদ্ধকে আর অবতার বলে মানিনে!

আইয়ার অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করলেন, বললেন ঃ রাবণ বধের সময় এইখানে রামচন্দ্র সমুদ্র বন্ধন করেছিলেন।

এইসব দেখার বা আলোচনার লিপ্সা আজ মিটে গেছে। আমার চোখে আজ নতুন স্বপ্ন ঘনিয়ে উঠল ঃ

সুসুখং বত জীবাম বেরিনেসু অবেরিনো।
বেরিনেসু মনুস্‌সেসু বিহরাম অবেরিনো॥

অর্থাৎ বৈরীগণের মধ্যে আমরা বৈরহীন হয়ে সুখে জীবন যাপন করব, বিদ্বেষ ভাবাপন্ন মানুষ্যগণের মধ্যে বিদ্বেষশূন্য হয়ে বিচরণ করব?

এই বাণীই কি সারাবিশ্বের মর্মবাণী নয়? ধর্মপদের পাতায় একে আবদ্ধ করে রেখে আমরা কি বিশ্বেরই অকল্যাণ করবনা?

জাহাজ দুলছে। ভারতের উপকূলে দেখলুম নতুন আশার সঙ্কেত।

নয়

বিন্ধ্য পর্বতের উত্তরে আবার ফিরে এলুম। এবারে আর সমতল নয়, একেবারে হিমালয়ের গায়ে। জানিনা, এই পাহাড়ের কী মায়া! মানুষের মায়াও কি কম! নিনিলার কথা আমার চিরদিন মনে থাকবে। পুরাঙের জুম্পান পুসোর মেয়ের নাম নাকি নি নি লা। তাই শুনে রাম সিং তার নাৎনির এই নাম রেখেছিল।

সুশ্রী পাহাড়ী মেয়ে, কিন্তু পাথরের মতো কঠিন একেবারে নয়। কিছু বলতে গেলেই তার চোখ জোড়া ছলছল করে ওঠে।

বলি: উপায় যে নেই নিনিলা, এখান থেকে তোমাদের উঠতেই হবে।

মেয়েটা যেন বুঝেও বোঝে না। নিঃশব্দে চেয়ে থাকে। বেদনায় বিষণ্ণ তার গভীর দৃষ্টি। নীরব থেকে আঘাত করে বেশি।

অবাধ্য নদী ঘর্ঘরা। আজ কয়েক বছর ধরে প্রাকৃতিক সৌজন্য-বোধ বুঝি হারিয়ে ফেলেছে। প্লাবন আনছে বছরে বছরে। দুরন্ত আক্রোশে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে মানুষের সারা বছরের সম্পদ। সরকার এবারে তাকে বেঁধে শাসন করবে, যেমন করে দামোদরকে শাসন করেছে, করেছে তুঙ্গভদ্রাকে। নেপাল-ভারত সীমানায় আমরা কালী নদীকে বাঁধছি।

টনকপুরে নেমে যাঁরা কৈলাস গেছেন, এ পথ তাঁদের চেনা। আরও খানিকটা উজিয়ে কালী ও গৌরীর সঙ্গম। তার উত্তরেই আসকোট। যাঁরা আলমোড়া থেকে কৈলাস গেছেন, তাঁরা সরযূ ও রামগঙ্গা পেরিয়ে এসেছেন আসকোট! সরযূ আর রামগঙ্গার সঙ্গম দেখেন নি। আসকোট ছেড়ে ধারচুলার পথে দেখেছেন কালী ও গৌরীর মিলন। গৌরীগঙ্গার পুল পেরিয়ে সেই বিকট বনের কথা

নিশ্চয়ই তাঁদের মনে পড়বে। দু দিকে পাহাড়, আর নদীর তীরে তীরে পায়ে চলার সঙ্কীর্ণ পথ। চীরবনের কথা মনে পড়বে না, পড়বে ভাঙগাছের কথা। লাঠি দিয়ে সে গাছ সরিয়ে সাবধানে পথ চলতে হয়েছিল। তার পর চড়ায়ের মুখে দুরন্ত গর্জন এসেছিল কানে। রাস্তার পূর্ব দিক থেকে আর একটা নদী এসে গৌরীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এই হল কালী নদী।

এখনও মনে পড়ছে না? তবে আরও একটু বুঝিয়ে বলি। জোলজুবি গ্রাম মনে আছে, যেখানে এক ব্রহ্মচারীর আশ্রম দেখেছিলেন? দশবারো ঘর পাহাড়ীর বাস, কার্তিক মাসে তবু মেলা হয় বলে শুনেছিলেন? সেখান থেকে আপনারা উত্তরে গেলেন কালী নদীর তীরে তীরে, আমরা কাজ করছি কিছু দক্ষিণে। পাকা বাঁধের কাজ আমাদের শেষ হয়ে গেছে। এবারেও বর্ষায় নদীর জল রুখতে হবে। জল যেখানে জমবে, সেখানকার লোক সরাতে হবে আমাকে। নিরাপদ স্থানে নতুন গ্রাম তৈরি হয়েছে, সরকারী খরচে নতুন গ্রাম, নতুন বাড়ি। খুশী হয়েই সবাই উঠে যাচ্ছে! যাচ্ছে না নিনিলা আর তার ঠাকুরদা রাম সিং।

রাম সিং বলে: তুমি আমাকে বোকা বোঝাবে বাবু? বোকা বুঝিয়ে চোদ্দ পুরুষের ভিটেছাড়া করবে?

সে কি! বোকা বোঝালুম কিসে!

ছোট ছোট চোখ আরও ছোট করে রাম সিং বলে: বোঝাচ্ছেন তো! এই পাহাড়ে জল জমার কথা কেউ কখনও শুনেছে? এমন অসম্ভব কথা আমার বাপ-ঠাকুরদাদার মুখেও কখনও শুনি নি।

একটু থেমে বলে: আর আমার নিজের বয়সও কম হল না। নিনিলা যখন এতটুকু মেয়ে, বাপ মা দুজনকেই হারাল একদিনে। তখনই আমার তিন কুড়ি পেরিয়েছিল—

কথাটা অসমাপ্তই থেকে যায়। বৃদ্ধের মন ডুবে যায় কোন বেদনার্ত অতীতের ভিতর।

আমি ভাবি, কিন্তু ভেবে কোন উত্তর খুঁজে। পাই নে যে ঘটনা সে নিজে দেখে নি, শোনে নি তার বাপ-ঠাকুরদার মুখে, তা সে কেমন করে বিশ্বাস করবে। তার বিশ্বাসের সীমা যে বড় সংকীর্ণ। চারিদিকে উঁচু উঁচু পাহাড় ঘেরা এই গ্রামটুকুর মতোই সীমাবদ্ধ। তার দৃষ্টি যেমন পাহাড়ে ধাক্কা খায়, কল্পনার ফানুসও ওড়ে না সমতলের মানুষের মতো, যারা আজ কালী নদীকে বাঁধতে এই পাহাড়ে উঠেছে।

এক সময় রাম সিং হা-হা করে হাসে, হেসে বলে: তোমরা আমাকে ঠকাবে বাবু, অত বোকা আমি নই। তোমাদের মতো বই না পড়ে থাকতে পারি, কিন্তু ওই বই যারা লিখেছে তাদের চেয়েও যে বেশি দেখেছি আমরা। বেশি জেনেছি এই পাহারকে। প্রকৃতির খেয়ালখুশির কথা আজ তোমরা আমাকে শেখাবে!

আমি উত্তর দিই না। রাম সিং তবু বলে: তোমার বড় বড় কথা ওই ছেলে ছোকরাদের বল, যারা অভিজ্ঞতার অভাবে ভয় পাবে, আর পয়সার লোভে পৈতৃক ভিটে ছাড়বে। আমাকে তোমরা রেহাই দাও।

কিন্তু রেহাই দিই কী করে! পাহাড়ে বর্ষা নামতে আর দেরি নেই। এবারের জল আর নিচে যাবে না। সব রুখতে হবে। এই জলে বিদ্যুতের কারখানা চলবে। আর প্রয়োজনমত লোহার দরজা খুলে সেই জল যাবে চাষের জমিতে। উপর থেকে কড়া হুকুম পেয়েছি লোক সরাবার, সরিয়েওছি। হেরে যাচ্ছি রামসিং ও তার নাৎনীর কাছে।

বুড়োকে ছেড়ে নাৎনীকে চেপে ধরি। বলি: বুড়োকে তোমার বোঝাও নিনিলা।

নিনিলাও বুঝি বিশ্বাস করে না আমার কথা। বলে, ও বুঝবে কেন? ও যে অনেক দেখেছে।

সেই এক কথা, অনেক দেখেছে। রেগে বলি: কিছুই দেখে নি।

পৃথিবীটা কি শুধু এই পাহাড় দিয়ে ঘেরা। তার বাইরে কি কিছুই নেই! তুমি তো গেছ আমাদের বাঁধ দেখতে, অমন যন্ত্রপাতি আগে কখনও দেখেছ! অত লোকজন আর অত শব্দ!

তা বটে।

নিনিলা স্বীকার করে। পরক্ষণেই তার চোখ জোড়া ছলছল করে ওঠে।

তাড়াতাড়ি স্বর বদলাই। বলি: উপায় যে নেই নিনিলা, এখান থেকে তোমাদের উঠতেই হবে।

মেয়েটা যেন বুঝেও বোঝে না। নিঃশব্দে চেয়ে থাকে—বেদনায় বিষণ্ণ তার গভীর দৃষ্টি। নীরব থেকে আঘাত করে বেশি।

কালী নদীর বুকে আজ জলের উচ্ছ্বাস নেই। পাথরের নুড়ির উপর দিয়ে নুয়ে নুয়ে চলেছে। বড় একখানা পাথরের উপর এসে বসলুম। সহকারী মাথুর আসতে চেয়েছিল। তাকে ছুটি দিয়েছি। সে বলে: আপনি এদের বড় বেশি আহ্লাদ দিচ্ছেন। আমার ওপর ছেড়ে দিন, আমি এদের জীপে তুলে নতুন গাঁয়ে পৌঁছে দিই।

আমি বলি: সে যে আমার হার হবে মাথুর, ওদের হার নয়! ওরা তা হলে জিতেই যাবে।

দুঃখ করে মাথুর বলে: সত্যি কথা বলতে কি, আমার এত ধৈর্য নেই। শুধু একটা মানুষের জন্যে কম দিন তো আমাদের নষ্ট হল না! রোজ রোজ এখানে আসতে না হলে, অন্য কিছু করা যেত।

আমি মেনে নিয়ে বলি, সত্যি কথা। কাল থেকে আমি একাই আসব।

মাথুর বুঝি লজ্জা পায়। বলে: আমায় ক্ষমা করবেন সার, সে কথা আমি বলি নি। আমি আপনার জন্যেই ভাবছি।

মাথুরকে আমি ছুটি দিই। বলি: তুমি এবারে ফিরে যাও। গাড়ি নিয়েই যাও। এ পথটুকু আমি হেঁটে যাব।

আমিই হেঁটে যাই : মাথুর উত্তর দেয় : গাড়ি আপনার জন্যেই থাক্।

তর্ক করবার প্রবৃত্তি অনেক দিন হারিয়ে ফেলেছি। চুপ করে থাকি।

কয়েক পা এগিয়ে মাথুর আবার ফিরে আসে। বলে, সেই ছোকরা আবার আসছে। আমি থেকেই যাই।

হেসে বলি : কে, দৌলত সিং? ওকে ভয় পাও নাকি?

ওর হালচাল আমার পছন্দ হয় না—দেখেন নি, কেমন নেশা-খোরের মত চোখ!

আমি হাসি।

মাথুর বলে : আপনি হাসছেন! কিন্তু বলুন তো, এখানে ওর কিসের দরকার! নতুন ঘর দিয়েছি, জমি দিয়েছি, টাকা দিয়েছি! করে-কর্মে খা। তা নয়, এইখানে এসে ঘুর ঘুর করে। কে জানে, বুড়ো রাম সিংকে হয়তো সেই পড়াচ্ছে!

মাথুরের চোখে যা পড়ে নি। আমার তা পড়েছে : হেসে বলি : তোমার ভয় নেই। তুমি যাও।

মাথুরের অনেক আপত্তি। তবু কথা শোনে।

আমার চোখ ছিল চীরবনের দিকে। সোজা লম্বা গাছগুলো গায়ে গায়ে যেন ঘনিয়ে আছে। ঝড় এলে কেমন দেখাবে, চোখ বুজে সেই দৃশ্য দেখবার চেষ্টা করলুম। উত্তর থেকে এক ঝলক বাতাস এল মর্মরিয়ে, হালকা বাতাস। গাছ দুলল না, কয়েকটা শুকনো পাতা ঝরে পড়ল, আর কালী নদীর স্বচ্ছ জল একটু যেন নেচে উঠল।

বাবুজী!

নিনিলা যেন হামাগুড়ি দিয়ে কাছে এল। কোথা দিয়ে এল জানি না। বললুম : সে কি, এখানে এলে কেন?

দৌলত আবার এসেছে।

বললুম : তোমার কাছেই তো এসেছে। তুমি কেন পালিয়ে এলে ?

আমার কাছে না, আর কিছু !

নিনিলা বিশ্বাস করে না আমার কথা। পাশে আর একখানা পাথরের উপর চেপে বসে।

ক্লান্ত সূর্য পাহাড়ে আড়াল হয়েছে, এখনও ডোবে নি। পাহাড়ের ছায়া পড়েছে দুধার থেকে, কিন্তু অন্ধকার নামতে আরও দেরি আছে। নিনিলা সেই আলো-ছায়ার দিকে চেয়ে চুপ করে বসে রইল। কথা কইল না।

বললুম : তুমি আমাকে বাঁচতে দেবে না, তাই না নিনিলা ?

কেন বাবুজী ?

নিনিলার দৃষ্টি গভীর হল।

বললুম : তোমাদের সরাতে না পারলে আমার সরকারী চাকরিটা যাবে, আর—

একটু থেমে বললুম : আর প্রাণটা যাবে দৌলতের হাতে।

খুশিতে ঝলমল করে উঠল নিনিলার চোখ। বলল : তোমার কোমরে তো পিস্তল আছে। কুকরী দিয়ে ও কী করবে !

অন্ধকারে পেছন থেকে বসিয়ে দেবে।

নিনিলা চমকে উঠল, চকিতে পিছন ফিরে দেখল।

আমি হেসে ফেললুম। লজ্জা পেল নিনিলা।

রাস্তার উপর আমার জীপ দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকার গভীর হলে পথ চলতে পারব না। সঙ্কীর্ণ সরু পথ।
এক দিকে পাহাড় আর অন্য দিকে কালী নদী। আর একটু পরেই কালীর মতো কালো হয়ে যাবে চারিদিক। বললুম : এবারে বাড়ি যাও নিনিলা। দৌলত তোমাকে খুঁজতে বেরবে।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে ছিলুম। নিনিলাও উঠে দাঁড়াল। বলল : দৌলত ফিরে গেলে বাড়ি ফিরব।
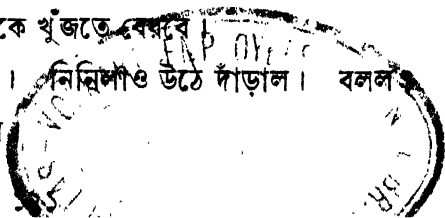
হেসে বললুম : দৌলত লুকিয়ে তোমাকে দেখছে।

নিনিলা আর একবার চমকে উঠল।

গাড়ির কাছে গিয়ে দেখি, মাথুর ফিরে যায় নি। পাহাড়ের গায়ে হেলান দিয়ে সিগারেট খাচ্ছে। আমাকে আসতে দেখে সিগারেট ফেলে এগিয়ে এল। বললুম : তুমি যাওনি ?

মাথুর জবাব দিল না।

অনেকদিন একসঙ্গে আছি। তার মনের খানিকটা খবর পেয়েছি। হেসে বললুম : আমার জন্যে ভয় নেই।

মাথুর এ কথারও জবাব দিল না। সরাসরি পিছনে গিয়ে বসল, ড্রাইভারের পাশের জায়গাটা ছেড়ে দিল আমার জন্য।

রাম সিং আর নিনিলার গল্প আরও অনেকে শুনেছে। এ নিয়ে কিছু আলোচনাও হয় ইঞ্জিনীয়ার-মহলে। মিসেস জুনেজা একদিন চেপে ধরলেন, বললেন : সত্যি কথাটা আপনি গোপন করে যাচ্ছেন।

সত্যি কি গোপন করা যায় ?

যায় বই কি : মিসেস জুনেজা তর্ক করেন : এতদিন এত ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করছি, তবু কি আপনার সব কথা আমরা জানতে পেরেছি।

হেসে বললুম : যতটুকু সত্য, তার চেয়ে বেশি জেনে ফেলেছেন বলেই মুশকিল হচ্ছে। আমার কাজ মানুষ নিয়ে, মিস্টার জুনেজার মতো ইট-পাথর নিয়ে নয়। আপনার মত থাকলে, কাজ আমরা পালটে নিতে পারি।

অনেকে হাসলেন প্রাণভরে। কিন্তু মিসেস জুনেজা দমলেন না। বললেন : কিছু মনে করবেন না, বাচাল বলে বাঙালীর বদনাম শুনেছি। এখানে এসে সেই ভুল ভাঙছে।

দূর থেকে শব্দ এল গুম গুম করে। পাহাড়ের ভিতর ডিনামাইট ফাটাচ্ছে। মিসেস শর্মা লাফিয়ে উঠলেন। গৃহস্বামিনী তিনি।

মিস্টার শর্মা এই ব্যস্ততার কারণ জানেন। বললেন: ভয় নেই, বন্ধ হবে না।

দেওয়ালের বড় ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে ছিলেন মিসেস শর্মা। পেণ্ডুলাম থেমে পড়তেই উল্লসিত হয়ে উঠলেন। বললেন: বন্ধ হবে না আবার! এই অভিজ্ঞতা নিয়ে কী করে যে কাজ করছ, তুমিই জান।

মিসেস জুনেজা সায় দিলেন। বললেন: আমিও তাই ভাবি। এবারের বর্ষায় বাঁধও না ভেসে যায়!

গুম গুম করে আবার শব্দ ওঠে। পাহাড়ের নিচে বিজলির কারখানা হবে। তার জন্য প্রশস্ত জায়গা চাই। ইঁদারার মতো সুড়ঙ্গ দিয়ে বাঁধের জল যাবে, তাইতেই কল চলবে। বিদ্যুৎ জন্মাবে। অন্ধকার হিমালয় হবে আলোয় আলোকময়।

মিস্টার জুনেজা আপত্তি করলেন। বললেন: অনধিকারচর্চা। আমাদের বড় সাহেবের বাড়ি যাও। নক্‌শা খুলে তিনি বুঝিয়ে দেবেন যে, ইলেকট্রিক ট্রেনে চেপে ভারতবর্ষের লোক যাচ্ছে কৈলাসদর্শনে।

মিস্টার শর্মা বললেন: মানস সরোবরে একটা জংশন হবে। পূর্বে গার্থক লাদাক হয়ে কাশ্মীর, আর পশ্চিমে জাংপোর তীরে শিগাসে ও লাসা।

মিসেস জুনেজা হেসে উঠলেন খিলখিল করে। বললেন: আপনি কোন দিকে যাবেন?

বলে কৌতুকভরা চোখে চাইলেন আমার দিকে।

ঘড়িটা চালিয়ে দিয়ে মিসেস শর্মা তাঁর নিজের জায়গায় ফিরে এসেছিলেন। ঠিক আমার পাশেই। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন: ঘাবড়াবেন না আপনি আমি চা আনতে যাচ্ছি।

মিস্টার শর্মা বললেন, তাই আন। চায়ে চুমুক দিলেই বাঙালীর বুদ্ধি খোলে।

মিস্টার জুনেজা আর এক পাশে ছিলেন। চেয়ারখানা টেনে একেবারে ঘনিয়ে এলেন। বললেন: কিন্তু আমি একটা সুপরামর্শ দিচ্ছি।

বলে গলাটা একেবারে নামিয়ে আনলেন।

গায়ে-পড়া উপদেশ আমার ভাল লাগে না। তবু শুনতে হল। মিস্টার জুনেজা বললেন: জাতটা ভাল নয় শুনেছি। রোগ নেই এমন মেয়েপুরুষ কম।

ইঙ্গিতটা অভদ্র, কিন্তু উত্তর দেবার প্রবৃত্তি হল না। পাহাড়ের এই মানুষগুলোকে আমার চেয়ে বেশী চেনেন না কেউই। আমি রোজ দু বেলা তাদের দেখছি, ঘনিষ্ঠভাবে মিশছি। না মিশলে এতগুলো গ্রামের লোক সরাতে পারতুম না। গায়ের জোরে মানুষের সংস্কার ভোলানো যায় না। সংস্কার তো পরিধেয় বস্ত্র নয় যে কেড়ে নেওয়া যায়, দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গও নয় যে কেটে বাদ দেওয়া চলে। ও যে একান্তভাবে মনের জিনিস। ওর উপর মনেরই জোর খাটে। সেই জোরেই এই অসাধ্যসাধন করে আসছি।

মিস্টার জুনেজার কথার উত্তর আমি দিলুম না। কিন্তু তিনি থামলেন না। বললেন: এদের গল্প আজ নয়, অনেক দিন আগেই আমি শুনেছি আমার এক কৈলাস-প্রত্যাগত বন্ধুর মুখে। এইখেনেই কোন এক গ্রাম, কিংবা আরও কিছু ওপরে।

তাঁর মুখটা আমার কানের কাছে এনে বললেন: শতকরা আশি জনের ওই রোগ।

তার পর সহজ হয়ে বসে বললেন: হবে নাই বা কেন বলুন! এমন চরিত্রহীন জাত তো চট করে নজরে পড়ে না।

মিসেস জুনেজা শুনতে পেয়েও যেন শুনতে না পাওয়ার ভান করলেন। হাসছিলেন মিস্টার শর্মা।

মিস্টার জুনেজা হঠাৎ সজাগ হয়ে উঠলেন। বললেন এদের সম্বন্ধে আর একটা কথা শুনলুম। কথাটা কি সত্যি?

উত্তর না দিয়ে আমি তাঁর মুখের দিকে তাকালুম।

মিস্টার জুনেজা বললেন: এরা নাকি বিয়ে করে রীতিমতো কোর্টশিপ করে!

মিসেস জুনেজাও এবারে আগ্রহান্বিত হলেন। মিসেস শর্মা ভিতর থেকে ফিরছিলেন। বললেন: কাদের কথা বলছেন?

বেয়ারার হাত থেকে চায়ের পেয়ালা সংগ্রহ করে মিস্টার জুনেজা বললেন: এই পাহাড়ীদের কথা।

মিসেস শর্মা নিজের হাতে আমার চা এগিয়ে দিলেন, বসলেন আমার পাশেই। মৃদুস্বরে বললেন: লস্যি করি নি, আজ আপনিই জোর পাবেন সবচেয়ে বেশি।

এ তাঁর পুরনো কথা। পঞ্চনদবাসী জুনেজা-দম্পতি নাকি লস্যি খেয়ে বেশী জোর পান। আমরা বাঙালীরা চায়ে। আমিও মৃদুস্বরে বললাম: ধন্যবাদ।

মিস্টার জুনেজা এ সব কথায় কান দিলেন না। প্রবল উৎসাহে নিজের গল্পই শোনাতে লাগলেন। বললেন, এদের গ্রামে রাম্‌বাঙ বলে নাকি একটা ঘর থাকে, মানে একটা নাইট ক্লাব, অবিবাহিত তরুণ-তরুণীদের জন্যে। রাত্তিরবেলায় সেজেগুজে তারা এই রামবাঙে আসবে, মদ খেয়ে মাতাল হবে, নাচবে গাইবে, তার পরে হবে প্রেম-বিনিময়।

মিস্টার জুনেজা টেনে টেনে হাসতে লাগলেন। মনে হল, তিনি নিজেই বোধ হয় কিছু গলাধঃকরণ করে এসেছেন। বললেন: এক-আধ দিনেই বিয়ের সম্বন্ধ হয় না। রাম্‌বাঙের ভেতর পরিচয় নিবিড় হবে, প্রেম গভীর হবে। তার পর কন্যার সম্মতি হলে আংটি উপহার দিয়ে অভিভাবকদের সম্মতি চাওয়া হবে। কী রকম আধুনিক ব্যাপার বলুন তো?

মিস্টার শর্মা আশ্চর্য হলেন। বললেন: কার কাছে শুনলেন এসব?

মিস্টার জুনেজা খানিকটা গৌরবের হাসি হাসলেন, বললেন: বাঙালী সাহেবের কাজ না হয় নাই জানলুম, খবর রাখতে দোষ কী?

তা ঠিক।

উত্তর দিলেন মিস্টার শর্মা। দৃষ্টিতে তাঁর প্রশ্ন তখনও জড়িয়ে আছে।

মিস্টার জুনেজা বললেন, আমার এক অ্যাসিস্টেণ্ট এই পথে কৈলাস গিয়েছিল। তার মুখে আজ এই গল্প শুনলুম। বললে, এ দেশের মেয়েরা তেমন সুবিধের নয়, তাদের এড়িয়ে চলাই ভাল।

বলে আড়চোখে আমার দিকে চাইলেন।

মিস্টার শর্মা বললেন: কী আশ্চর্য ব্যাপার বলুন! হিমালয়ের এটা পশ্চিম প্রান্ত, পূর্ব প্রান্ত ঠিক যেন উলটো।

সবাই কৌতূহলী হলেন।

মিস্টার শর্মা বললেন: গত মহাযুদ্ধের সময় রাস্তা তৈরি করতে গিয়েছিলুম আসাম-ব্রহ্ম সীমান্তে। সেখানে পাহাড়ী জাত দেখেছিলুম সিংফোদের। কী কঠিন তাদের প্রাক্‌বিবাহজীবন। মোরাঙের ভেতর গ্রামের সমস্ত অবিবাহিত যুবককে পাহারা দিচ্ছে বুড়ো সর্দার। আর বুড়ীরা সব মেয়েদেরও আর একটা মোরাংয়ে বন্ধ করে রেখেছে। রাত্রে কারও সাক্ষাৎ হবার উপায় নেই। বিয়ে স্থির হলে তো আরও মুশকিল। দিনের বেলাতেও মুখদর্শন নিষেধ।

মিস্টার জুনেজার বোধ হয় এ কথা বিশ্বাস হল না। কিংবা মনে হল, মিস্টার শর্মা তাঁকে অবিশ্বাস করছেন। বললেন: আপনি এদের রামবাঙ দেখেন নি?

বললুম: না।

না!

মিস্টার জুনেজা যেন আর্তনাদ করে উঠলেন, বললেন: আপনার এত জানাশুনো, আর আপনি দেখেন নি বলছেন।

আমি উত্তর দিলুম, সহজভাবে বললুম, কৈলাসের পথে পাহাড়ের ওপর কী হয় জানি নে। আমরা প্রায় সমুদ্রসমতলেই আছি। এদের আচার-ব্যবহার আমাদেরই মতো।

মিস্টার জুনেজা তাঁর চায়ের পেয়ালাটা নামিয়ে রাখলেন ঠক করে, বললেন: আপনি তাহলে কিছুই জানেন না। চারিদিকে পাহাড়ে ঘেরা পড়ে আছি। আপনি একে সমতল বলছেন!

মিস্টার শর্মা হাসছিলেন। মিসেস শর্মাও। এক সময় মিসেস শর্মা আমাকে বললেন: আজও আপনি বেঁচে গেলেন।

ভেবেছিলুম নিনিলাদের গ্রামে আর যাব না। মনটাকেও বেশ শক্ত করেছিলুম। আমার কী! আমার দায়িত্বই বা কতটুকু! গ্রামশুদ্ধ সবাইকে সরিয়ে দিয়েছি। এদেরও ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করে দিয়েছি। জেদ করে এরা যদি সরতে না চায় তো আমি কেন দায়ী হব এদের গোঁয়াতুর্মির জন্য! মাথুর খুশী হয়েছিল আমার সংকল্পের কথা শুনে। সে-কথা প্রকাশ করেই ফেলল। বলল: আমি এই কথাই আপনাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছি নানা ভাবে। কাগজে পত্রে দেখিয়ে যাব, তারা সরে গিয়েছে। তার পরে তারা বুঝবে।

কী বুঝবে বল তো?

অন্যমনস্কভাবে আমি তাকে প্রশ্ন করে বসলুম।

মাথুর বলল, বুঝবে: এতদিন ধরে আমরা সত্যি কথা বলছি কি না!

কিন্তু—

কথাটা আমি সম্পূর্ণ করতে পারলাম না। আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল তুরন্ত বন্যার ছবি। বাঙলা দেশের ছেলে আমি বন্যার ভীষণতা আমার জানা আছে। বন্যার নামে এখনও বুকের ভিতর মোচড় দেয়।

মাথুর আমার মনের আভাস খানিকটা পেয়েছে। বলল : তারা কি আর ডুবে মরবে! তার আগেই প্রাণ নিয়ে পালাবে। রাস্তার ওপর আমরা না হয় জীপ নিয়ে অপেক্ষা করব।

বললুম : তার দরকার হবে না। প্রাণ থাকতে রাম সিং তার ভিটে ছাড়বে না। আমি ভাবছি—

নিনিলার নামটা মুখে আটকে গেল। আশ্চর্য লাগল নিজের কাছেই।

মাথুরও বোধ হয় লজ্জা পেল। বলল : আমিও সেই কথাই ভাবছিলুম সার, শেষ পর্যন্ত বুড়োটা নড়লে হয়!

মাথুর চালাক ছেলে সন্দেহ নেই। সযত্নে নিনিলার নামটা এড়িয়ে গেল।

সন্ধ্যা নেমেছে অনেকক্ষণ। চারিদিকে রাতের অন্ধকার ঘন হচ্ছে। পাহাড় ভাঙা আজ বন্ধ আছে, যন্ত্রপাতির শব্দ থেমে গেছে সূর্যাস্তের পরেই। চারিদিক থমথম করছে শব্দের অভাবে। খোলা জানলা দিয়ে মাথুর একবার বাহিরে তাকাল।

বললুম : কী দেখছ?

কিছু না।

মাথা নেড়ে মাথুর জবাব দিল তৎপরভাবে। আমি তার চমকানি দেখে হাসলুম।

মাথুর যে অপ্রস্তুত হল তার মুখের ভাব দেখেই তা বুঝতে পারলুম। তবু তার বলার কথাটুকু চেপে গেল।

বললুম : মাথুর, আমরা আজ এতদিন একসঙ্গে কাজ করছি, আমার কাছে লুকোবার প্রয়োজন কি তোমার ফুরবে না?

মাথুর বলল : না সার, আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না।

তোমাকে আমি ঠিকই বুঝি।

মাথুর আর দেরি করল না। বলল : সেই ছোকরা বড় উপদ্রব করছে।

দৌলত ?

মাথুর উত্তর দিল : অনেক দিন ওকে আপনার বাঙলোর চারপাশে ঘুরে বেড়াতে দেখেছি। অন্ধকারে একা একা। ওর মতলব এখনও বুঝতে পারি নি।

আমি হাসলুম তার ভাবনার কথা শুনে।

আপনি হাসছেন সার ঃ মথুর লজ্জা পেল : লোকটাকে আমার ভাল মনে হয় না। কেমন চোরের মতো লুকিয়ে লুকিয়ে ঘোরে। মতলব খারাপ না হলে সামনে এগিয়ে আসত।

ওর যে ক্ষতি করেছি আমি। অত বড় ক্ষতি কি আমি ছাড়া আর কেউ করতে পারত!

মাথুর আশ্চর্য হল। বলল : আপনি ওর ক্ষতি করেছেন ?

আমিই তো করেছি। আমি তাকে ভিটেছাড়া করিনি ?

মাথুর আশ্বস্ত হল খানিকটা। বলল ঃ তাতে ও খুশীই হয়েছিল। নতুন ঘর, জমিজমা, টাকা—গুনে গুনে বুঝে-সুঝে নিয়েছে। দু হাত তুলে আশীর্বাদ করেছে আমাদের। ওর কথাগুলো এখনও আমি ভুলি নি। একদিন বলেছিল, বাবু, এবারে আমি ঘর বাঁধতে পারব। আর একদিন বলেছিল, আপনারা না এলে কী করতাম তাই ভাবি। লোকটা এখন কী ভাবছে জানি নে।

বললুম : জিজ্ঞেস কর নি তাকে ?

এখন যা ভাবছে, তা কি বলবে! তাই কাছে দেখতে পেলেই তাড়া দিই। আপনার বেয়ারাকেও বলে দিয়েছি, এদিকে যেন ঘেঁষতে না দেয়।

আপত্তি করে বললুম : ছি-ছি, এ করেছ কী! ওর যে আসল কথাটাই এখনও জেনে নেওয়া হয় নি।

আসল কথা!

মাথুর আশ্চর্য হল।

আসল কথাই তো জানতে ওর বাকি আছে। সে কথা জানবার অবকাশ তাকে দিলে কই ?

আশ্চর্য চোখে মাথুর আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

বললুম: নিনিলার কথা। তার কী হবে! আগ্রহ করে যখন নতুন গাঁয়ে উঠে গিয়েছিল, তখন কি সে জানত যে এরা যাবে না!

কেন, এরা তো গোড়া থেকেই আপত্তি করেছে।

তা করেছে। কিন্তু আমরা যে হেরে যাব, তা বোঝে নি।

মাথুর খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল: কিন্তু তাই বলে এমন চোরের মতো অনুসরণ করবার কী দরকার!

দরকার নেই! ওই মেয়েটাকে নিয়েই তো সে ঘর বাঁধতে চেয়েছে। সেই মেয়েই যদি না এল তো ঘর বাঁধবে সে কাকে নিয়ে?

কিন্তু ও মেয়েটা কি!

কথাটা মাথুর শেষ করতে পারল না।

বললুম: আর কিছু ভেবে থাকলে ভুল করেছ।

মাথুর মাথা নিচু করল, কোন প্রতিবাদ জানাল না।

আমি চিনি তাকে, জানি তাকে। তার লজ্জার কারণও জানি, তবু নিজে লজ্জা পাই নে। বিশ্বাস করি নে তাদের জানায়। ওই পাহাড়ীদের কাছে আমি কর্তব্য করতে যাই। আর কিছুর জন্য নয়। এরা সেই কথাটা বোঝে না বলেই লজ্জা পায়।

জানালার বাহিরে অন্ধকার হয়েছে দোয়াতের কালির মতো। মাথুর বসে ছিল সেই দিকে মুখ করে। হঠাৎ কী দেখে লাফিয়ে উঠল।

বললুম: কী হল?

আমায় উত্তর না দিয়েই মাথুর জানলার দিকে ছুটে গেল। হাতের টর্চটা ফেলল বাহিরের রাস্তার উপর। সরু কালো পিচের রাস্তাটা সেই আলোয় ঝকঝক করে উঠল।

উত্তেজনায় আমিও উঠে দাঁড়িয়ে ছিলুম। বললুম: ব্যাপার কী?

একটা নিশ্বাস ফেলে মাথুর ফিরে এল। বলল: সেই ছোকরা।

ততক্ষণে আমি আবার বসে পড়েছিলুম। হেসে বললুম: তোমার মাথা খারাপ। এত রাতে দৌলত আসবে এইখানে?

প্রবলভাবে আপত্তি জানাল মাথুর। বলল, আমি ঠিক দেখেছি সার, ও নির্ঘাত দৌলত। ও ছাড়া আর কেউ হতে পারে না।

মাথুর হাঁপাচ্ছিল।

আমি হাসলুম।

ক্ষুণ্ণ হয়ে মাথুর বলল : আমি তা হলে আসি সার।

যেতে যেতেও ফিরে দাঁড়াল। বলল : একটু সাবধানে থাকবেন।

এ কথার উত্তরেও আমি হাসলুম।

তুমি হাসছ বাবুজী!

নিনিলার চোখ জোড়া আবার ছলছল করে ওঠে।

উঠতে বললেই কি ওঠা যায় : নিনিলার কণ্ঠে যেন কান্নার সুর লেগেছে : এই নদী, এই পাহাড়, এই মাটি, এই পাথুরে পথ—এরই সঙ্গে যে আমাদের নাড়ির যোগ বাবুজী।

আমি হাসি। কিন্তু ছলছল করে ওঠে কালী নদীর কালো জল। নিনিলার চোখও ছলছল করে। বলে : আমাদের দুঃখ তুমি কী বুঝবে! এ যে গরিবের দুঃখ। ভগবান বোঝে না, তো মানুষ!

পয়সা না থাকলেই কি মানুষ গরিব হয় : আমি প্রতিবাদ করি এবারে : এই পথ উঠে গেছে কৈলাসে, বরফের রাজ্য কৈলাস। সেইখানেই তো আছে সমস্ত ঐশ্বর্যের রাজা যক্ষ কুবের। শুনেছি তার একটাও পয়সা নেই।

নিনিলা আশ্চর্য হয়ে আমার মুখের দিকে তাকায়।

বলি : সত্যিই তো। যোগী মহাপুরুষ দেখ নি, যারা পাহাড়ের গুহায় থাকে?

দেখেছি বইকি। সেবারেও তো এক সাধু এসে তিন দিন ছিলেন আমাদের গ্রামে।

বললুম : তবেই দেখ। তাঁদের চেয়ে বড়লোক কেউ আছে?

নিনিলা যেন বোঝে না আমার কথা। বোঝাবার চেষ্টাও করি না।

সেই বড় পাথরখানার উপর নিনিলা আমার পাশে এসে বসেছে। ডান দিকে হেলে একটা নুড়ি কুড়িয়ে নিল। বলল : ওই জায়গাটা দেখছ বাবুজী ? বলে নুড়িটা ছুঁড়ে ফেলল নদীর জলে।

কিছু দেখছি না তো : আমি। জবাব দিলুম, জায়গাটাই শুধু দেখতে পাচ্ছি।

নিনিলা উঠে দাঁড়াল। বলল : দেখবে ?

উঠবার ইচ্ছা আমার ছিল না। কিন্তু নিনিলা তার বাঁ হাতখানা বাড়িয়ে দিল। নরম নিটোল হাতখানা। সেই হাতে ভর করে আমি উঠে দাঁড়ালুম।

নিনিলা আমায় জলের কাছে টেনে নামাল। বলল : হাত দিয়ে টের পাবে না বাবুজী, পা নামাতে হবে।—

বলেই ঝুপ করে বসে পড়ে আমার জুতা জোড়া খুলে নিল। পায়ে মোজা ছিল না। বলল : এইবারে নেমে এস।

কালী নদীর জল এখানে অগভীর। পারের কাছে পাথরে পাথরে আছড়ে পড়ছে। প্যাণ্টের পা দুটো গুটিয়ে নিয়ে জলে নেমে পড়লুম।

নিনিলা বলল : কিছু দেখছ ?

না তো।

নিনিলা আমার হাত ধরে টানল। বলল : এইখানটায় এস।

বলে যেখানে ঢিল ছুঁড়েছিল সেইখানে টেনে আনল। জলে একটি পা নামাতে পারলুম, আর একটা পারলুম না। এত বেগ যে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

নিনিলা হাসছিল।

বললুম : তাই তো, একই নদী, একই জল, গভীর সমান, তবে এমন হল কেন !

সেই বড় পাথরখানার দিকে ফিরে আসতে আসতে নিনিলা বলল : একই দেশ, একই পাহাড়, মানুষগুলিও এক। তবু তফাত।

যেখানেই নিয়ে যাও বাবুজী, সে আমাদের গ্রাম হবে না, হবে না আমাদের ভিটে।

চলতে চলতে আমি থমকে দাঁড়ালুম।

নিনিলা বলল : এই নদীর সঙ্গে, এই বনের সঙ্গে এই পাহাড়ের সঙ্গে আমাদের নাড়ীর যোগ। কোন্ পাথরের ওপর পা দিলে পা হড়কাবে, দূর থেকে তা তোমাকে দেখিয়ে দেব। কোন্ গাছে চড়ুই পাখি বাসা বাঁধবে, তা তোমাকে চিনিয়ে দেব।

নিনিলা আরও কিছু হয়তো বলত, কিন্তু আমাকে হাঁ করে চেয়ে থাকতে দেখে লজ্জা পেয়ে থেমে গেল। আমি অন্য কথা ভাবছিলুম। ভাবছিলুম, নিনিলা বুঝি অশিক্ষিতা পাহাড়ী মেয়ে নয়। এও এসেছে নিচে থেকে বাঁধ বাঁধতে। মিসেস জুনেজা আর মিসেস শর্মার সঙ্গে এর প্রভেদ যেন এই মুহূর্তে আর খুঁজে পাচ্ছি না। মনে হল, আমাদের সমাজেরই একজন মহিলা আমার মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। পাহাড়ী পোশাক পরে আত্মগোপনের চেষ্টা তাঁর ব্যর্থ হয়েছে, ধরা পড়ে গেছে তার মুখের কথায়।

কী দেখছ বাবুজী ? নিনিলা হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল।

আমিও নিজেকে সামলে নিলুম। বললুম : তোমাকে। এসব কথা তুমি শিখলে কোথায় ?

আলতার ছোঁয়া লাগল নিনিলার গালে। বলল : আমরা কি কিছুই জানি নে ?

বলতে পারলুম না যে আমরা তাই মনে করি।

নিনিলা আবার পাশে এসে বসল। কী যেন ভাবল খানিকক্ষণ। তারপর বলল : আচ্ছা বাবুজী, সত্যি করে একটা কথা বলবে ?

আমি কি মিথ্যা বলি তোমাকে ?

সত্যি কথা বলতে নিনিলা এক মুহূর্তও দ্বিধা করল না। বলল : আমরা তো তাই ভাবি। এখান থেকে আমাদের ওঠাবার জন্যে রোজই তো মিথ্যে কথা বলছ।

আমাদের কথা যে এরা বিশ্বাস করে নি, তা জানি। তবু একটু আঘাত পেলুম। বললুম : সে কথা শিগগিরই বুঝতে পারবে।

মনে হল, খানিকটা উষ্মা যেন প্রকাশ পেল আমার কথায়। নিনিলার বুঝতে দেরি হল না। বলল : তুমি রাগ করলে বাবুজী ?

মেয়েটার দৃষ্টি কিছু সিক্ত হল।

তুমি আমাকে মিথ্যেবাদী বলবে, আর আমি রাগ করব না!

নিনিলা বলল : তুমি তো ইচ্ছে করে বল না, তুমি বাধ্য হয়ে বল। এ সব না বললে আমরা ভিটে ছেড়ে অন্য জায়গায় যাব কেন ?

আমি আশ্চর্য হলুম তার যুক্তি শুনে। বললুম : এ সব কথা বুঝি তোমার ঠাকুরদা বলেছে ?

বলেছে সবাই। তবু তারা গেছে! বড় গরিব কিনা আমরা, তাই লোভে পড়ে ভিটে ছাড়ি। চাকরি করতেও তো লোকে বিদেশে যায়। দৌলতের মামাই তো গেছে।

আমি আর তর্ক করলুম না। বললুম : কী জানতে চাইছিলে বল।

নিনিলা ভাবল একটুখানি। তারপর বলল : এ সব মিটে গেলে তুমি কোথায় যাবে বাবুজী ?

আমি হেসে ফেললুম তার কথা শুনে।

নিনিলা লজ্জা পেল।

কোথা থেকে খানিকটা হাওয়া এল মর্মরিয়ে, চীরগাছের ফাঁকে ফাঁকে। পিছন ফিরে চমকে উঠলুম। একটা ছায়া সরে গেল। মাথুর তো নয়, মাথুরকে আজ জোর করে ফিরিয়ে দিয়েছি।

নিনিলা মুখ নিচু করে ছিল। দাঁত দিয়ে কখন্ আঙুলের নখ কাটতে শুরু করেছে দেখতে পাইনি।

মাথুর বলল : এখানকার বাকি কাজ আমরাই সামলাতে পারব সার।

ফাইলের উপর চোখ রেখে বললুম : হুঁ।

আমি জানি, মাথুরের অনেক কিছু বলবার ছিল। আর এও

জানি, আমার এই সংক্ষিপ্ত উত্তরের পর সে আর কিছুই বলবে না। এই বিরাট পরিকল্পনায় আমার দায়িত্ব শুধু এই বাঁধেই সীমাবদ্ধ নয়। কাছেই আরও তুটো বাঁধের কাজ শুরু হয়েছে। সারদার তেজ কমাতেই হবে। ওধারে আরও বাঁধ আছে, ভেরী কর্নালীর বাঁধ। সেখান থেকে ডাক আসছে। অনেক জরুরী কাজ। কর্তাদের কাছ থেকে অন্যত্র যাবার হুকুম এসেছে। সেই তারখানা এগিয়ে দিয়ে মাথুর বলল : এখানকার বাকি কাজ আমরাই সামলাতে পারব সার।

শুধু তাই নয়। এখানে থাকার প্রয়োজনও আমার অনেক দিন আগে ফুরিয়ে গেছে। আমার মতো এ কথাটাও সবাই বুঝতে পারছে। অন্যত্র ক্ষতির কথাটাও। লোক সরাবার দায়িত্ব তো আমার নয়। তার জন্য এরাই যথেষ্ট। তবু কেন যাচ্ছি নে, মাথুর সে কথা জানে। সে কী সন্দেহ করে, তা আমিও জানি। কিন্তু বিশ্বাস করি নে। আমি ভাবি অসহায় রাম সিংদের কথা। আমি চলে গেলে মাথুর তাদের জোর করে সরিয়ে দেবে, না পারলে কিছুই করবে না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু মজা দেখবে। আমি তাই ফাইলের উপর চোখ রেখে বললুম : হুঁ।

আমার এই অস্বাভাবিক আচরণের কথা আজ কারও অজ্ঞাত নেই। শর্মা জুনেজার মত যাঁরা ঘনিষ্ঠ, তাঁরা তামাশা করছেন। চোখ টেপাটেপি করে হাসছেন অন্যান্য পরিচিতরা। কর্তাদের কানে ওঠে নি, এমন মনে হয় না। হঠাৎ কোনদিন কৈফিয়ত তলব করলেও বিস্মিত হব না।

মাথুরের আপত্তি অন্যখানে। লোকের চোখে আমি শুধু নেমেই যাচ্ছি না, নিজের জীবনটাকেও অকারণে বিপন্ন করছি। এই পাহাড়ীগুলোকে নাকি বিশ্বাস নেই। তাদের মুখে হয়তো মধু আছে, কিন্তু কুক্‌রিতে আছে বিষ। ওই কুকরির একটা আঁচড় লাগলে দেহের রক্ত পর্যন্ত বিষিয়ে যাবে। মেয়েগুলো আরও সাংঘাতিক। মাথুর সবাইকে ভয় দেখায়।

আমার এই গাম্ভীর্য দেখে মাথুর নিজেকে সামলে নিল। কিন্তু আমি চুপ করে থাকতে পারলুম না। বললুম : জল কতদূর পৌঁছল ?

মাথুর জবাব দিল : জল ! মনে হচ্ছে পরশু ও গ্রামে পৌঁছবে। একটু থেমে বলল : কালকের মত বৃষ্টি হলে হয়তো আজ রাতেই পৌঁছে যাবে।

আজ রাতেই !

ফাইল বন্ধ করে আমি উঠে দাঁড়ালুম। দেরাজ থেকে বার করে নিলুম বাইনকুলারটা। মাথুর আমার পিছনে এসে দাঁড়াল।

সারারাত্রি বর্ষণের পর সকালে রোদ আজ ঝকমক করছে। বাহিরে বেরিয়ে মনে হল, এ যেন বাঁধ নয়, এ অভ্রের এক খনি। ছোট বড় পাথর যেন অভ্রের এক একটা টুকরো।

বাঁধের উপরের রাস্তা এখনও সম্পূর্ণ হয় নি। ভারত সরকার নেপালকে সাহায্য করবেন। আমলেকগঞ্জ থেকে কাঠমণ্ডু পর্যন্ত মোটরের রাস্তা করে দিয়েছেন। এবারে পশ্চিম নেপালের উন্নতির জন্য টনকপুর থেকে শিলগাড়ি পর্যন্ত রাস্তা বেঁধে দেবেন। এই বাঁধের উপর দিয়ে সেই রাস্তা যাবে।

বাঁধের গা দিয়ে আমাদের উঠতে হবে। মাথুর বলল : জিপটা নেই। বললুম : থাক্, হেঁটেই উঠি।

কলকব্জার ঘড়ঘড়ানি কমে গেছে। পাহাড় খুঁড়ে পাথর আনা বন্ধ হয়ে গেছে। সেই পাথরও আর যন্ত্রের খলে ফেলে নোড়া দিয়ে গুঁড়ো করা হয় না। ছোট বড় নানা আকারের যে সব নুড়ি পাথর এখনও জমা হয়ে আছে, তাতেই বাকি কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। পুরোদমে কাজ হচ্ছে ওধারের পাহাড়ের নিচে, যেখানে জল-বিজলির কারখানা বসবে।

বাঁধের লোহার দরজা বন্ধ আছে, পূবের দরজাটি শুধু খোলা। তারই ভিতর দিয়ে প্রবল বেগে জল পড়ছে। মনে হচ্ছে, আরও

দু-একটা দরজা খুলে না দিলে বাঁধটা হয়তো ভেঙেই যাবে। মোটরের রাস্তা ধরেই আমরা বাঁধের উপর উঠতে লাগলুম।

চুপ করে থাকতে মাথুরের বোধ হয় অস্বস্তি লাগছিল। বলল : দিব্বি ঘাস গজিয়েছে এবারে।

মালীরা খুরপি চালাচ্ছিল ঘাসের ভিতর। বাঁধের কাঁচা অংশটা শক্ত করবার জন্য এই ঘাস লাগাবার ব্যবস্থা। বিদেশ থেকে বীজ এসেছে। এতদিন বাঁধের এই অংশটা টেকো মাথার মতো বিচিত্র ছিল। স্থানে স্থানে সবুজ। বর্ষার জল পেয়ে সমস্ত জায়গাটাই প্রায় সবুজ হয়ে এল। বললুম : আমাদের কাজ ফুরোচ্ছে।

আমাকে কথা বলতে দেখে মাথুর কিছু উৎসাহ পেল। বলল : কাল গিয়েছিলাম রাম সিংএর বাড়ি।

মাথুর আমার উৎসাহ লক্ষ্য করবার জন্যই বুঝি আমার মুখের দিকে তাকাল। বলল : তার দাওয়া থেকেই জল দেখা যাচ্ছে।

তাই না কি!

আমার ভাল লাগল এই সংবাদটি।

উৎসাহ পেয়ে মাথুর বলল : আমি জিজ্ঞেস করলাম বুড়োকে, এতদূর জল উঠতে কখনও দেখেছে কি না!

কী বললে সে?

মাথুরের কথায় আজ আমিও যেন উৎসাহ পাচ্ছি।

কী আর বলবে! চুপ করে বসে রইল। তার চিরকালের বিশ্বাসে ফাটল ধরেছে, কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না।

আর?

মাথুর বলতে লাগল : আর মেয়েটা বেশ ভয় পেয়েছ দেখলাম। মনে হল, তাদের ভেতর এ নিয়ে আলোচনাও হয়েছে।

তাদের বিপদের কথা ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছ তো?

বুঝিয়েছি বইকি সার। বলেছি, আর দু-একটা রাত! তারপর সব ভেসে যাবে—এই ভিটে মাটি গরু বাছুর সব। কাউকে আর

খুঁজে পাওয়া যাবে না। জল একবার এসে পড়লে চেষ্টা করেও আর বাঁচতে পারবে না। দু দিক থেকে জল আসবে।

মাথুর এর আগে জল জমা কখনও দেখে নি। নতুন চাকরি করতে এসে এই সব কল্পনা করতে শিখেছে। বাধা না দিয়ে আমি তাকে বলবার সুযোগ দিই। স্বল্পভাষী ছেলে, অল্পেই থেমে যায়। বলল : বুড়োকে অনেক বুঝিয়েছি সার। তার জীবন তো শেষ হয়ে এসেছে, ভিটে আঁকড়ে ডুবে মরা তার হয়তো সাজে। কিন্তু মেয়েটা? সেও যে তার সঙ্গে ডুবে মরছে!

একটু থেমে বলল : সত্যি বলছি সার, এমন মেয়েও আমি দেখি নি। শুধু দৌলত নয়, আরও পাঁচজন তাকে বোঝাতে আসছে। বুড়োর না হয় ভীমরতি ধরেছে, সে তো সব বোঝে। গোটা জীবনটাই তো তার পড়ে আছে।

এতক্ষণ আমরা পূব দিকে যাচ্ছিলুম, এবারে মোড় নিয়ে পশ্চিমে উঠতে লাগলুম। সোজা গিয়ে বাঁধের উপরে পড়ব।

মাথুর বলল : দৌলত আমায় কী বলছিল জানেন?

কী?

মাথুর উত্তর দিল : বলছিল, রাম সিংদের ঘরের জানালাগুলোও যেন বন্ধ করিয়ে দিই। তা না হলে ওদের বড় কষ্ট হবে।

সরকারী নক্শা অনুযায়ী যে বাড়িগুলি আমরা তৈরি করিয়ে দিয়েছি, তাতে সব ঘরে জানালা আছে। এরা কেউই সে জানালা চায় না। বলে, হাওয়ায় তাঁদের কষ্ট হয়। পাথর আর মাটি দিয়ে তারা সব জানালা বন্ধ করে নিচ্ছিল। খবর পেয়ে আমরাই সেগুলো গেঁথে বন্ধ করে দিয়েছি। এরা যায় নি। এদের জানালাগুলো তাই বোধ হয় বন্ধ করা হয় নি।

আমি অন্য প্রশ্ন করলুম : দৌলত কি ভাবছে তারা উঠে যাবে?

মাথুর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উত্তর দিল : বোধ হয় তাই আশা করছে।

আর তুমি ?

মাথুর চুপ করে রইল।

বললুম : উত্তর দিচ্ছ না যে ?

কী উত্তর দেব ! রাম সিং প্রতিজ্ঞা করে আছে যে সে তার পূর্বপুরুষের ভিটে কিছুতেই ছাড়বে না।

এমন গোঁ কেন বলতে পার ?

পাঁচজনে যা বলে তা শুনেছি।

প্রশ্ন না করে আমি তার মুখের দিকে তাকালুম।

মাথুর বলল : সে নাকি তার বাপ-ঠাকুরদার কাছে সত্যবদ্ধ। আজকালকার ছেলেদের মতো ভাগ্যের খোঁজে ভিটে ছেড়ে যাবে না।

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

পথ আর একটুখানি বাকি। মাথুর বলল : কদিন থেকে বুড়ো একটা নতুন পথ ধরেছে ! নাৎনীকে দৌলতের হাতে দিতে চায়। সমানে জবরদস্তি করছে।

একটু থেমে বলল : কিন্তু—

কিন্তু কী ?

মেয়েটা রাজী হচ্ছে না।

রাজী হচ্ছে না ?

হলে এতদিনে বিয়েই হয়ে যেত। আত্মীয়স্বজনেরা তো এরই অপেক্ষা করে আছে।

এসব কথা মাথুর আমাকে বলে নি। আজ কেন বলছে তাও জানি না। সেও হয়তো উদ্বিগ্ন হয়েছে, বিপন্ন বোধ করছে। এই বাঁধে পুনর্বাসনের ভার তারই উপর। প্রথমবারেই ছুটো প্রাণ যাবে ! আমি উপস্থিত না থাকলে সে হয়তো অন্য ব্যবস্থা নিত।

অন্যমনস্কভাবে আমি প্রশ্ন করলুম : কেন রাজী হচ্ছে না জান ?

বোধ হয়—

বোধ হয় কী ?

মাথুর সামলে নিল নিজেকে। বলল : ঠাকুরদাকে ছেড়ে বোধ হয় যাবে না।

এবারে আমরা বাঁধের উপরে এসে দাঁড়ালুম। দক্ষিণ থেকে এসেছি। কয়েকটা দিনেই উত্তরের চেহারা যেন বদলে গেছে। চোখে বাইনকুলার লাগিয়ে দেখলুম, যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু জল—চারিদিকের উঁচু জমির ভিতর বাঁধা পড়ে আছে। একখানা দুখানা নয়, কয়েকখানা গ্রাম ডুবে গেছে। নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। মনে হল, নিনিলাদের গ্রামও এমনই করে ডুবে যাবে। নিশ্চিহ্ন—

না না, নিশ্চিহ্ন হলে চলবে না। এখনও যে দুটো মানুষ সেখানে পড়ে আছে। তাড়াতাড়ি বাইনকুলার নামিয়ে বললুম : চল মাথুর, এখুনি একবার বেরিয়ে পড়ি।

মাথুর বিস্মিত হল। কোথায় ?

বললুম : রাম সিংদের গ্রামে।

সে কি সার্ ?—মাথুর আমাকে নিরস্ত করবার চেষ্টা করল : আজ এখুনি যে আপনাকে ফিরে যেতে হবে !

ফিরে যেতে হবে !

মনে পড়ল তারের কথা। কর্তৃপক্ষের নির্দেশের কথা।

মাথুর আমাকে ভাববার অবকাশ দিল না, বলল : আমি তাদের ভার নিচ্ছি সার, আপনি নিশ্চিন্ত মনে ফিরে যান।

এর উপর আর জোর করা চলে না। নিজের চাকরির চেয়ে সাধারণ দুটো পাহাড়ী মানুষের সুখ দুঃখ বড় হয়ে উঠবে, ভাবতেও কেমন বেয়াড়া লাগে। এরা সব বলবেই বা কী ! বললুম : সেই ভাল। ওদের সরাবার ব্যবস্থা তুমি ক'রো।

টনকপুর থেকে ট্রেন ধরতে হবে। আয়োজন সম্পূর্ণ করে যখন জীপে উঠলুম, ঘন কালো মেঘে আকাশ তখন ছেয়ে গেছে। দুপুরের খাওয়া সেরে পুরুষেরা কাজে গেছেন, মেয়েরা বাড়িতে। প্রতিবেশী

মিসেস শর্মা ও মিসেস জুনেজা এসে আমার আয়োজন দেখছিলেন। তাঁদের কাছে বিদায় নিতে যেতেই আপত্তি তুললেন। বললেন : এই অবেলায় কি না গেলেই নয়? আর যাবেনই বা কী করে?

বললুম : হুকুম এসেছে, যেতে আমাকে হবেই।

মিসেস জুনেজা হেসে বললেন : কিন্তু বিধাতার হুকুম যে অন্য।

আকাশের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন : দেখতে পাচ্ছেন না?

আমি কিছু বলবার আগেই মিসেস শর্মা বললেন : আজ রাতটা থেকে কাল সকালে যান।

মিসেস জুনেজা হেসে বললেন : যাবার আগে—

আমার মুখের দিকে চেয়ে কথাটা সম্পূর্ণ করলেন না।

নমস্কার করে আমি বিদায় নিলুম।

কিন্তু বিদায় নিলেই হয় না। খানিকটা দূর পৌঁছতেই আকাশ অন্ধকার করে ঝড় উঠল। ড্রাইভারকে বললুম : আস্তে আস্তে চল।

খুব সন্তর্পণেই ড্রাইভার চলেছিল। আমার কাছ থেকে যখন থামবার নির্দেশের প্রত্যাশা করছিল, তখন পেল আস্তে চলবার আদেশ। এরই ভিতর পাশ ফিরে একবার দেখে নিল।

বুঝতে পারি, তার আশ্চর্য হবার কথা। পরিষ্কার দিনেও আমি আস্তে আস্তে চলতে বলি। আর এই দুর্যোগেও থামতে বলছি না। সামনের পথ আর দেখা যাচ্ছে না। সূর্যাস্তের আগেই গভীর রাত মনে হচ্ছে। ড্রাইভার হেড লাইট জ্বেলে নিয়েছে অনেকক্ষণ।

এইবার জলের ছাট পাওয়া গেল, বৃষ্টি নামছে। ড্রাইভার আমার মুখের দিকে আর একবার তাকাল। গম্ভীর হয়ে বসে রইলুম, কোনও কথাই বললুম না।

মান্নালালের দোকান-ঘরখানা পেরিয়ে যাবার সময় ড্রাইভার করুণ চোখে আমার মুখের দিকে চাইল। নিশ্চিন্ত আশ্রয়। এখানে রাত্রিবাস করলে দুটো খেতেও পাওয়া যাবে। বেশিদূর আসি নি।

ঝড় থামলে বাড়ি ফেরাও সম্ভব হবে। কিন্তু আমি আমার কর্তব্যে স্থির হয়ে আছি।

মড়মড় করে একটা শব্দ এল সামনে থেকে। ড্রাইভার থেমে পড়ল। বললুম: কী হল?

তার উত্তরের জন্য অপেক্ষা করতে হল না। একটা লম্বা ঝাউগাছ সরু পাহাড়ী পথের উপর সশব্দে ভেঙে পরল। ভেঙে পড়ল, না উপড়ে পড়ল! অন্ধকারেও ড্রাইভারের মুখখানা দেখতে পেলুম। চোখ তার জ্বলজ্বল করছে। হাত জোড় করে প্রণাম করল দেবতাকে।

তাড়াতাড়ি নেমে পড়েই আমার স্যুটকেস আর হোল্ডঅল নিল কাঁধে। অন্য উপায় নেই। আমার স্যাচেল আর অ্যাটাচি কেস হাতে নিয়ে আমিও নামলুম।

আশ্রয় নিতে হল মান্নালালেরই দোকান-ঘরে। ঝিরঝির করে জল পড়ছিল। এবারে চেপে এল।

রাত তখন কত জানি না। সবাই অকাতরে ঘুমচ্ছে। বৃষ্টির ধারায় আর সে ধার নেইঁ। শুধু একটানা শব্দ। আর মাঝে মাঝে বাতাসের দীর্ঘশ্বাস। আমার নিদ্রাহীন চোখের সামনে ভেসে উঠল বিস্তীর্ণ জলরাশি, কলকল করে উত্তরের পাহাড়ের দিকে ঠেলে যাচ্ছে। চারিদিকে জনমানব নেই। শুধু দুটি প্রাণী, জলের উপর দাঁড়িয়ে তাদের কর্তব্য ভেবে পাচ্ছে না।

কী নৃশংস! লোকটাকে গুলি করে মারা উচিত। নিজেও মরবে, সঙ্গে নিয়ে যাবে ওই সরল মেয়েটাকেও। মনে হল, ওই বুড়োটাকে না মেরে মস্ত ভুল করেছি। এখনও তার সময় আছে কি?

স্যুটকেসের ভিতর থেকে রিভলবারটা বার করে নিলুম। বর্ষাতি ছিল গায়ের উপরেই। পুরনো টিনের ছাদ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে। বড় টর্চটা বার করে পথে এসে দাঁড়ালুম। দীর্ঘ পথ। হোক দীর্ঘ। একটা প্রাণের চেয়ে অন্য কিছুই বড় হতে পারে না।

যে পথে এসেছি সেই পথ ধরে এগিয়ে গেলুম। একসময় বাঁধের বাতি দেখতে পেলুম। উঁচুনিচু নানা স্থানে হাজার হাজার বাতি জ্বলছে। আর তারই পাশে সমস্ত বস্তিটা আছে ঘুমিয়ে। রাস্তার বাতিগুলো শুধু মিটমিট করে জ্বলে একটা ঘুমন্ত লোকালয়ের আভাস জানাচ্ছে।

সে পথ আমি সন্তর্পণে এড়িয়ে গেলুম। পাহাড়ীদের সরু হাঁটা-পথে আমি সেই বিরাট জলাশয়ের ধারে এসে পৌঁছলুম।

মাথার টুপি বেয়ে জল পড়ছে, চশমার কাচ মুছে নিচ্ছি ঘন ঘন। আকাশের দিকে চেয়ে সময়ের কোন হদিস পাচ্ছি না।

জলে আর কাদায় ভারি ঠেকছে নিজের পা দুখানা। আর যেন চলতে পাচ্ছি না। একটু বিশ্রামের দরকার। খানিকটা উপরে কয়েকটা বড় বড় গাছ জটলা পাকিয়ে আছে। ওইখানে পৌঁছলে বৃষ্টির হাত থেকে খানিকটা নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে। টর্চটা সামনে ফেলে দেখি, ওতেও আর জোর নেই। পায়ের কাছটুকুই শুধু আলো করছে, দূরের জিনিস আর দেখা যাচ্ছে না। বিদ্যুৎও আর চমকাচ্ছে না যে জায়গাটা একবার ভাল করে দেখে নেব।

কোনমতে সেই গাছগুলোর কাছে পৌঁছে একখণ্ড পাথরের উপরে ধপ করে বসে পড়লুম। মনে হল, সরসর করে একটা ছায়া সরে গেল। টর্চটা ঘুরিয়ে দেখলুম, ছায়া নয়, মানুষ। নিঃশব্দ ভীরু পদক্ষেপ তার।

সাহসে ভর করে আমি প্রশ্ন করলুম: কে, দৌলত?

দৌলত আরও যেন সঙ্কুচিত হল। কোনমতে উত্তর দিল: হুজুর।

এখানে কী করছিস?

কোন উত্তর এল না। লোকটা শীতে কাঁপছে, না ভয়ে, বুঝতে পারলুম না। বললুম: ওরা কোথায়?

কথা না বলে দৌলত সেই জলস্রোতের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল।

এখনও ওখানে!

করুণ ভাবে দৌলত বলল: ওরা তো ভিটে ছাড়তে পারবে না বুড়োর যে শপথ আছে।

পাহাড়ী প্রতিজ্ঞা। সে নাকি ভঙ্গ করা যায় না। শৈশবের কথা আমার মনে পড়ল। হকিখেলার মাঠে ফাউল করেছিলুম। চোট পেয়েছিল এক পাহাড়ী ছেলে। খুন নেবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছিল খেলার মাঠে। অনেক দিন পালিয়ে বেড়াবার পর বন্ধুরা বিবাদ মিটিয়ে দিল। গুড়ুং আমার খুন নিল আঙুলের ডগায় আলপিন ফুটিয়ে। প্রতিজ্ঞাভঙ্গ সে করে নি।

নিনিলার কী হবে ?

দৌলত আমার মুখের কথাই কেড়ে নিল : কী হবে নিনিলার ?

তার কণ্ঠস্বরে বুঝি কান্নার আভাস পেলুম।

মনে হল, দূরের জলস্রোতে শব্দ উঠেছে ছপ ছপ করে! আমরা উৎকর্ণ হলুম। পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়ালুম দুজনে। দৌলতের কোমরে আছে কুকৃরী, আর আমার পকেটে পিস্তল। তবু আমরা ভয় পেলুম না।

অন্ধকার তখন ফিকে হয়ে এসেছে। সেই শব্দ লক্ষ্য করে টর্চের আলো ফেললুম। খানিকটা এগিয়েই সেই আলো হারিয়ে গেল।

পকেটের ভিজে রুমালে আমি আমার চশমার কাচ আবার মুছে নিলুম। তাড়াতাড়ি চোখে লাগিয়ে দৃষ্টিকে সংহত করবার চেষ্টা করলুম। দৌলতের দিকে চেয়ে দেখলুম, বিস্ময়ে সে বুঝি হতবাক হয়ে গেছে।

ওরা আসছে।

অস্পষ্ট ভাবে দৌলত কথা কইল।

আমি যেন একটি ছায়া দেখছি। আর একটি ছায়া কি কাঁধের উপরে! রাম সিং কি তার শপথের কথা ভুলে গেল, না তার চেয়েও বড় কিছুর সন্ধান সে পেয়েছে!

আর্তনাদের মতো একটা শব্দ করে দৌলত জলের উপর লাফিয়ে পড়ল।

পকেটের রিভলবারটার কথা হঠাৎ আমার মনে পড়ল। পূর্বের দিগন্তে তখন জ্যোতির্ময়ের প্রসন্ন বিজ্ঞাপন।